

দৈনন্দিন গল্পের অল্পপত্র

কবিতা

৩ বর্ষ ২ সংখ্যা জুন-আগস্ট ২০০৫

চি টি পত্র ■ রমানাথ রায় ৭

গল্প

অনুভব বিশ্বাস ■ অনুসরণ ১৯

সৌম্যদীপ ■ কালো কলম সোনালী মুখটি ২০

মৃগাঙ্কমৌলি বিশ্বাস ■ বাঁপ ২৫

দেবব্রত মিত্র ■ অশেষ গুপ্ত-র মৃত্যু চাই ৪১

বিদ্যুৎ গোস্বামী ■ লাশ ৫০

সুকুমার পাল ■ গোবর্ধন ভাবছে ৫৫

নন্দিনী নাগ ■ সে এসেছিল ৫৮

অভিজিৎ কুন্ডু ■ অমিয়র গল্পো ৬১

রজত বিশ্বাস ■ আনন্দলোক ৬৪

স্বপ্নজিৎ চৌধুরী ■ প্রাণ-চিত্র ৭৩

তৃপ্তায়ন চট্টোপাধ্যায় ■ ককেশাস মমি

সলোমনভ ৭৮

সমুদ্র ঝড়ল শইকিয়া ■ ঠাকুরদার কুর্সি ৮৬

নিমাই ঘোষ ■ ভাত ৯০

পাচু রায় ■ নীলিমায় নীল ৯৩

মনোজ চাকলাদার ■ ঠাকুমা পাখি

হয়ে গেছে ১০০

সুরঞ্জন প্রমাণিক ■ একটি রাজনৈতিক

পোস্টারের জন্ম ১০৭

অনুবা দ গল্প

চন্দ্রশেখর রথ ■ রুগির জন্য নীরব প্রার্থনা ১১২

মার্সেলা কারবাজো ■ যা আমরা শুনতে

চাই না ১২০



নারায়ণ সান্যাল স্মরণিকা

অজিতদাস

আমার স্মৃতিতে নারায়ণ সান্যাল ১২৮

ড. নীরদবরণ হাজারা

কৃষ্ণাগারিক নারায়ণ সান্যাল এবং আমি ১৩২

সুধীর চক্রবর্তী

নভেলিস্ট ১৩৯

চন্দন সান্যাল

কাছ থেকে দূরে ১৪৪

আজিজুল হক

আলোচনাতে উপেক্ষিত হয়েও বেস্ট সেলর ১৫২

চন্ডী লাহিড়ী

চির রোমান্টিক—নারায়ণ সান্যাল ১৫৪

প্রদীপ দত্ত

সত্য-নারায়ণ ১৫৮

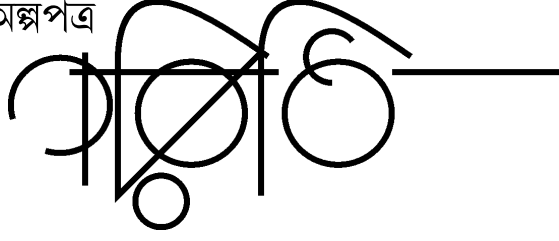
আলোকচিত্র ১৬১-১৬৮

গ্রন্থতালিকা ১৬৯

পুনর্মুদ্রণ ■ নারায়ণ সান্যাল-এর গল্প

বাসাবদল ১৭২

দৈনন্দিন গল্পের অল্পপত্র



DAINONDIN GOLPER ALPOPATRA PORIDHI

RNI No. : WBBEN/2003/12242

পরিধির বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ৬০ টাকা, সডাক ৮০ টাকা বিভিন্ন জেলায় পরিধির বিস্তৃতি কামনা করেন যে সকল উৎসাহী পাঠক লেখক তাদের জন্য আমরা সাম্মানিক গ্রাহক যোজনা শুরু করছি। পরিধির বিস্তৃতি চাইলে আপনি যা করতে পারেন : আপনার অঞ্চলের বা নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হয় এমন ছয়জন পাঠককে পরিধির গ্রাহক করুন (ডাক ব্যতীত)। আমরা তাঁদের সংখ্যাগুলি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব আমাদের ডাক খরচে। আপনাকে যা করতে হবে তা হল সেগুলিকে হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া এবং ১৫ দিন পর তাঁদের সংক্ষিপ্ত পাঠ-প্রতিক্রিয়া আমাদের লিখে জানানো। পরিধির তরফে এই কাজ করবার জন্য আপনি হবেন পরিধির অমূল্য সাম্মানিক গ্রাহক।

সম্পাদক : সৌম্যদীপ

স্বত্বাধিকারী সৌম্যদীপ কর্তৃক ২২ জে. এন. বিশ্বাস লেন, পাত্র বাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক নিউ রেনবো ল্যামিনেশন, ৩১এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

প্রাক মুদ্রণ কার্য : লেজার গ্রাফিক্স, ৩ মধু গুপ্ত লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২



নারায়ণ সান্যাল স্মরণিকা

লিখেছেন :
অজিত দাস
ড. নীরদবরণ হাজরা
সুধীর চক্রবর্তী
চন্দন সান্যাল
আজিজুল হক
চন্ডী লাহিড়ী
প্রদীপ দত্ত

পত্রিকার তরফে :

কৃষ্ণাঙ্গারিক নারায়ণ সান্যালকে নিয়ে ক্রোড়পত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই ঠিক হয় একটিতে হবে না, বেশ কয়েকটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে হবে। তাই এই প্রথম ক্রোড়পত্রে শুধুই ব্যক্তিগত স্মৃতিস্রাব। তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ন করবার কোনো চেষ্টা এতে নেই। হয়তো লিটল ম্যাগাজিনের প্রচলিত কায়দায় একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা যেত কিন্তু ম্যাগাজিনের বিশেষ সংখ্যা করার ব্যাপারটা আমাদের একদম পছন্দ নয়। তাই বিভিন্ন সাধারণ সংখ্যার মাঝে এমনই ক্রোড়পত্র জুড়ে আমরা নারায়ণ সান্যালের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবো, তাঁর যথোপযুক্ত মূল্যায়নের চেষ্টা করবো।

বোধহয় একটাই শব্দ আছে যা তাঁর সম্পর্কে বলা যায়— ‘জিনিয়াস’, বোধহয় একটাই উপাধি দেওয়া যায়— ‘লর্ড’, আদর্শ কৃষ্ণাঙ্গারিক চরিত্রের উদারনৈতিক সামন্ততান্ত্রিক দিকটিকে সম্মান জানিয়ে। হ্যাঁ তিনি বাংলা সাহিত্যের ‘লর্ড’। খুব জোরের সাথে একথা বলা যায় যে, শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, সারা পৃথিবীর কোনো ভাষায় কোনো সাহিত্যিককে পাওয়া যাবে না যিনি এককভাবে নারায়ণ সান্যালের সাথে তুলনীয় হতে পারেন। আমাদের বাংলা সাহিত্যে যারা লিখে খান তাঁদের অনেকেরই শ’দেড়েক বই আছে কিন্তু তার মধ্যে পড়বার মত, মনে রাখবার মত, বড় জোর পাঁচ কি দশ, সেখানে নারায়ণ সান্যাল-এর সবটাই ‘ওয়ার্থ রিডিং’। পরিধির পাঠক পাঠিকা বাবা-মায়েদের কাছে একটা বিশেষ অনুরোধ আছে, নারায়ণ সান্যালের বইগুলি আলমারীতে রাখুন, আপনার সন্তানের বড় হবার পথে এই বইগুলি যেভাবে তাকে গড়বে তা অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয়। আর সেটাই হবে ওই জ্ঞানী মানুষটির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো।

এই ক্রোড়পত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে আশাতীত সাহায্য পেয়েছি নারায়ণ সান্যালের ভাগ্নে শ্রী সুবাস মৈত্রের কাছ থেকে। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না।

কৃষ্ণাঙ্গার থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ‘পরিধি’ মহান কৃষ্ণাঙ্গারিক নারায়ণ সান্যালকে যথোচিত সম্মানজ্ঞাপন করতে পেরে আনন্দিত ও গর্বিত।

প্রণাম।

সম্পাদক/পরিধি

চিৰ উন্নত বিদ্রোহী শিৰ লোটাৰে না কাৰো পায়ে
তোমাৰেই শুধু কৰিব প্ৰণাম হে অন্তৰতম প্ৰভু

জন্ম : ২৬ এপ্ৰিল, ১৯২৪ মৃত্যু : ৭ ফেব্ৰুৱাৰি, ২০০৫

[illegible]

আমার স্মৃতিতে ‘নারায়ণ সান্যাল’

অর্জিত দাস

১৯৪৩ সালে আমি কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হলাম আই. এ ক্লাশে, প্রথমবর্ষে। নারায়ণ সান্যাল তখন এই কলেজেই বি. এস. সি পাঠরত। রূপবান সপ্রতিভ যুবক। কলেজ পত্রিকার সম্পাদক।

পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখলাম, প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে কলেজ বাড়ির সামনের অংশের ছবি। ফটোগ্রাফ নয়। নারায়ণ সান্যালের হাতে আঁকা ছবির ব্লক। নারায়ণ সান্যাল তাহলে ছবি আঁকতে পারেন! পত্রিকাটিতে তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্পটির নাম : $H_2 + O = H_2O$

তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র। জলের বৈজ্ঞানিক সূত্র নিয়ে গল্পটি লিখেছেন। পড়ে আনন্দ পেলাম। ভাল লেখেন তো!

কলেজে নাটকভিনয় ছিল ছাত্রদের। রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা। নারায়ণ সান্যাল প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় মঞ্চে ঘুরে ঘুরে বই বাজিয়ে গান গেয়ে আসর মাতিয়ে দিলেন। কোথাও জড়তার বালাই নেই।

আমার সহপাঠী বন্ধু অশোক মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক) বলল, নারায়ণ সান্যাল খুব গুণী ছেলে। আসানসোল রেলওয়ে স্কুলের ছাত্র। আমি ওই স্কুলে পড়তাম। এঁকে চিনি। ভাল আবৃত্তি করতে পারেন।

আমরা ক্লাশের কিছু ছাত্র মিলে ‘আরতি সংঘ’ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়েছিলাম। সেই সংঘের পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগরের ‘চিত্রমন্দির’ সিনেমা হলে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের আয়োজন করা হল। অশোকের ইচ্ছা আবৃত্তি করার। সে নারায়ণ সান্যালকে ডেকে আনল তার বাড়িতে। তাকে কবিতা আবৃত্তিতে তালিম দেওয়ানোর জন্য। নারায়ণবাবু রবীন্দ্রনাথের ‘ছবি’ কবিতাটি আবৃত্তি করে অশোককে তালিম দিলেন। অশোক ছিল দেবনাথ স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাইপো। নারায়ণ বাবুদের বাড়ির কাছেই ওদের বাড়ি।

চিত্রমন্দিরের অনুষ্ঠানে নারায়ণবাবু নিজেও একটি আবৃত্তি করেছিলেন।

আরতি সংঘের পক্ষ থেকে হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করা হল। অশোক বলল, চল নারায়ণ বাবুকে দেখাই উনি এসব ভাল বোঝেন। আমরা দুজন পত্রিকাটি হাতে নিয়ে সকালবেলা নারায়ণ বাবুর বাড়ি গেলাম। নারায়ণবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পত্রিকাটি দেখলেন ভাল করে। তারপরে বললেন, ভাই পত্রিকাটা কদিন রাখতে হবে আমার কাছে। আমার বাবাকে পড়াব। বাবা এসব বিষয়ে খুব উৎসাহী। পড়ে আনন্দ পাবেন। বাবা ছেলেদের এই সব সাহিত্য শিল্পচর্চা খুব পছন্দ করেন। পত্রিকাটা কদিন থাক আমার কাছে। আমি তো পড়বই, বাবার মতামতও জানাব।

নারায়ণবাবুর এইসব কথাবার্তায় আমরা কিছুটা অবাক হলাম। ব্যতিক্রমী আচরণ বলে বোধ হল। আমাদের সমাজে যেন পিতা পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক প্রায় শাসক শাসিতের মত, বাবার সামনে ছেলে পালিয়ে বেড়াবে, বাবার সামনে দাঁড়িয়ে ছেলে মুখ তুলে সহজভাবে কথা বলতে পারে না,

বাবার কাছে সেটাই গর্বের বিষয়।

কিন্তু নারায়ণবাবু তাঁর পিতার প্রতি কত শ্রদ্ধাশীল। যা বললেন তাতে মনে হয় ওঁদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটা বেশ মধুর।

নারায়ণবাবুর পিতৃদেব ছেলেদের সাহিত্য শিল্পে সঙ্গীত আবৃত্তি চর্চা পছন্দ করেন, ভালবাসেন এটাও আমাদের কাছে অবাক করার মত বিষয়।

সাধারণ ভাবে সমাজে তখন বিপরীত হাওয়া— শিক্ষক অভিভাবক সকলেরই বাণী হচ্ছে অধ্যয়নই কাজ। অধ্যয়ন বলতে পাঠ্যপুস্তক পড়া। তার বাইরে যা কিছু সব বিষবৎ পরিত্যাজ্য। গান গাওয়া, ছবি, আঁকা, গল্প নভেল পড়া নিষিদ্ধ। অভিনয় করা তো দূরের কথা ওসব দেখাও গর্হিত কর্ম— ছেলেদের গোপ্লায় যাওয়ার পথ। আমি শিক্ষকের ছেলে, অশোক শিক্ষকের ভাইপো— আমরা এ বিষয়ে ভুক্তভোগী। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ এল স্কুলে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্ররা প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়ে বলল, স্যার ছুটি দিন।

প্রধান শিক্ষক ধমক দিয়ে বললেন,

কিসের ছুটি? ক্লাসে যাও

ছাত্রা পলাতক। প্রধান শিক্ষক বললেন, হল কি? এরপর কি বাঈজী মরলে ছুটি দিতে হবে?

এ তো আমার নিজ কানে শোনা কথা।

তাই নারায়ণ সান্যালের কথা শুনে আমরা বিস্মিত। তখন তো জানতাম না নারায়ণ সান্যালের পারিবারিক পরিচয় কথা।

জানা ছিল না নারায়ণ সান্যালের পিতামহী আর বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ ডাঃ অমিয় নাথ সান্যালের জননী দুই বোন। এঁরা কৃষ্ণগরের ডাঃ কালীচরণ লাহিড়ীর দুই কন্যা।

কাশীচরণ লাহিড়ী ডেভিড হোয়ারের স্কুলের ছাত্র। ডেভিড হোয়ারের পরামর্শেই তিনি ডাক্তারী পড়েছিলেন। কালীচরণ হচ্ছেন শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, মুক্ত চিন্তাবাদী। রামচন্দ্র লাহিড়ীর ভ্রাতা। এঁদের খুড়তুতো ভাই দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কণ্ঠ গায়ক। বাঙলা ভাষায় ভাল গান না থাকায় তিনি গান রচনা করে ‘গীত মঞ্জরী’ নাম দিয়ে বই প্রকাশ করেছিলেন। গদ্য সাহিত্যেরও চর্চা করেছেন। তাঁর পুত্র কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র সাধক গায়ক দিলীপ কুমার রায়। এই ঐতিহ্যবাহী উত্তর পুরুষই নারায়ণ সান্যাল ও তাঁর পরিবার।

২

দেশ স্বাধীন হল। নারায়ণ সান্যাল তখন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার। কর্মস্থল কৃষ্ণগর। তখন তিনি লেখালেখি শুরু করেছেন।

‘সাহিত্য সঙ্গীতি’ ছিল কৃষ্ণগরের সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চাকারীদের একটি বিশিষ্ট সংস্থা। মাসে মাসে অধিবেশন হত সেই সংস্থার।

আবার স্থানীয় দেবনাথ স্কুলে ওই সংস্থার অধিবেশনে নারায়ণ সান্যাল একটি কবিতা পাঠ করলেন। কবিতার বিষয় ইট— থান ইট। তিনি একজন বাস্তবকার। ইট দিয়েই কাজ করেন। ইটের গুরুত্ব মহাত্মা যে কত এই সভ্য সমাজে সেই কথাই বলতে চেয়েছেন এই কবিতায়। তাঁর এই

বিষয়ের নতুনত্ব ও কাব্যিক বর্ণনায় উচ্ছ্বাসিত সকলেই বাহবা দিলেন। বলার কথা এই যে তিনি যে বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন তাকেই তাঁর কাব্যে সাহিত্যে আশ্রিত করতে চাইতেন। এটা ছিল তাঁর এক বিশেষ প্রবণতা। কৃষ্ণগরে ‘হোমশিখা’ নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশ শুরু হল। প্রতিষ্ঠাতা কালীপ্রসাদ বসু। কৃষ্ণগরের সাহিত্যসেবীরা এই পত্রিকা দপ্তরে যাতায়াত শুরু করলেন। সন্ধ্যাবেলা সেখানে সুধীজনদের আড্ডা জমে উঠত। আমি কিছুকাল এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম সহ-সম্পাদক হিসাবে। তখন নারায়ণ সান্যালও আসতেন সে আড্ডায়। নিয়মিত আসতেন না। অবসর মত আসতেন। হাসিখুশী মানুষ, গল্প জমাতেন ভাল। এই সময় তাঁর সঙ্গে আমার নতুন করে আলাপ জমেছিল। পত্রিকায় তাঁর তিনটি গল্প ছাপা হয়েছিল। বাণিজ্যিক পত্রিকা। ভাল লেখা খোঁজা হত। কলকাতার সুখ্যাত লেখকদের লেখা সংগ্রহ করা হত। এরপর ‘রাওয়াল’ নামে তাঁর একটি উপন্যাস ছাপা হয় ধারাবাহিক ভাবে। সেটাই তাঁর প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাস ছাপা হয়েছিল ছদ্মনামে। লেখাটি প্রকাশকালে কেউ জানতেন না ওটা কার লেখা। পাণ্ডুলিপি আসত ডাকযোগে। লেখকের নির্দেশ মত রচনার সম্মান দক্ষিণা পাঠান হত বেলুড় মঠে—লেখকের প্রণামী হিসাবে।

এরপর গ্রন্থাকারে স্বনামে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হল—বকুলতলা পি.এল ক্যাম্প। প্রকাশক ‘বেঙ্গল পাবলিশার্স’। কৃষ্ণগরে থাকাকালীন কর্মসূত্রে তাঁকে যাতায়াত করতে হত নদীয়ায় উদ্বাস্ত শিবিরগুলোয়। ধুবলিয়া তাহেরপুর, ফুলিয়া, ইত্যাদি উদ্বাস্ত শিবির ও কলোনীগুলোতে ঘর বাড়ি তৈরী ও দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। এই অভিজ্ঞতা থেকেই বকুলতলা পি.এল ক্যাম্পের সৃষ্টি।

এরপর তিনি বদলী হয়ে কলকাতায় চলে গেলেন। এরপর কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন। নিজের বাড়ি তৈরী করলেন ভবানীপুরে চব্ববেড়িয়া রোড নর্থ এলাকায়।

৩

নারায়ণবাবুর কলকাতার বাড়িতে একদিন গিয়েছিলাম। সকালবেলা বাড়ির দোতলায় বৈঠকখানা ঘরে ঢুকলাম। তিনি বাড়ির ভিতরে ছিলেন। বাইরে এসে আমাকে দেখে সহাস্য অভ্যর্থনা জানালেন। বসে বললাম, বেশ বাড়ি করেছেন।

বাইরের দেওয়ালের অলংকরণ ভাল লাগছে। বাড়ির ভিড়ে হারিয়ে যায় না। নজর কাড়ে। নারায়ণ বাবু হেসে বললেন, হ্যাঁ বাড়িটা বেশ চিহ্নিত হয়েছে। এখানকার লোকে বলে সাহিত্যিকের বাড়ি, কৃষ্ণগরে বাবার তৈরী বাড়িটাও তো বেশ চিহ্নিত। সবাই বলে ‘লাল বাড়ি’।

—কৃষ্ণগরে আপনারা তো চিহ্নিত পরিবার। এখন অমিয় কাকার (ডাঃ অমিয় নাথ সান্যাল) নাম ডাক। আপনার লেখালেখিও তো ভালই চলছে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখি নতুন নতুন বই এর।

—তা হচ্ছে। প্রথম দিকের কথা তো জানেন। বকুলতলা পি.এল ক্যাম্পের পাণ্ডুলিপি জমা দিলাম বেঙ্গল পাবলিশার্সে। মনোজ বসু বললেন বই ছাপতে পারি, তবে টাকা লাগবে। সাহিত্য জগতে আমি তো তখন অজ্ঞাত কুলশীল। সবখানেই তো প্রবেশমূল্য দিতে হয়। বললাম কত দিতে হবে? মনোজবাবু বললেন, পাঁচশো টাকা।

সে সময় ওটা অনেক টাকা। কিন্তু আমার সেটা দেবার সাধ্য ছিল। আমি টাকা দিয়ে দিলাম। বই ছাপা হয়ে গেল। প্রকাশন জগতে বেঙ্গল পাবলিশার্স রাজপথ। সে পথ দিয়ে আমার যাত্রা শুরু হল। কাজটা ভালই হয়েছিল। এখন আর অসুবিধা নেই।

— পত্র পত্রিকায় লিখছেন না?

— ‘দেশ’ পত্রিকায় লেখার চেষ্টা করেছিলাম, হল না। ওদের সঙ্গে মতে মিলল না। এখন বই লিখি, প্রকাশক বাড়ি এসে বই নিয়ে যান। আর কি দরকার। একটা ঘটনার কথা আপনাকে বলছি। কিছুদিন আগের কথা। রাত্রি তখন নটা, শীতকাল। শুনলাম কে একজন ডাকছেন। পথে দাঁড়িয়ে আছেন। নীচে নেমে গিয়ে দেখি একটি মোটর গাড়িতে এক বৃদ্ধ বসে আছেন। কাছে যেতেই বৃদ্ধ বললেন, আমি ডি. এম লাইব্রেরী থেকে আসছি। ওটা আমারই দোকান। আমি বললাম, হ্যাঁ আমি তো আপনাকে চিনি। তিনি বললেন, আমি আপনার একখানা বই চাইতে এসেছি। আপনার বই একখানা ছাপব। আমি বললাম, হাতে তো বই নেই। লেখা হলে আপনাকে দেব। তিনি বললেন, তাহলে কিছু টাকা রাখুন।

আমি বললাম, না টাকার দরকার নেই। কথা দিচ্ছি পরের বইটা আপনাকে দেব।

বৃদ্ধ আমার হাত ধরে অনুরোধ জানিয়ে বিদায় নিলেন। আমি অভিভূত। ডি. এম লাইব্রেরীর বৃদ্ধ মালিক শীতের রাতে আমার দরজায় এসেছেন বই চাইতে। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি বড় পুরস্কার কি হতে পারে একজন লেখকের জীবনে? আমি অভিভূত।

নারায়ণবাবু অফিসে যাবেন। ঘড়ি দেখলেন। চা পান করছিলাম। তিনি তাঁর উপন্যাস ‘পাষাণ্ড পণ্ডিত’-এর এক নখণ্ড উপহার দিয়ে বললেন, আবার আসবেন। আমি বিদায় নিলাম।

নারায়ণবাবুর সঙ্গে আরেকবার দেখা হয়েছিল বাদকুল্লায়। সেখানে ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতি হয়ে এসেছিলেন। আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম। দুপুরে স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী বিভা ঘোষ গোস্বামীর (তখন সাংসদ) বাসায় গিয়ে শুনলাম নারায়ণবাবু দোতলায় আছেন, বিশ্রাম করছেন। আমি নীচের ঘরে বসে ছিলাম। খানিক পরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমার নাম ধরে হাঁকতে লাগলেন— কই কোথায় তিনি? নীচে নেমে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। উপস্থিত সকলকে বলতে লাগলেন, আমরা বন্ধু। কৃষ্ণগরে একসঙ্গে সাহিত্য চর্চা করতাম।

আমি খুশী ছিলাম এই ভেবে যে, তিনি শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা একাধিক পুরস্কার-সম্মানে ভূষিত হয়েও সেই নারায়ণ সান্যালই আছেন। বদলে যাননি। মানুষ নারায়ণ সান্যাল তাই একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র।

তাঁর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। মাঝে মাঝে পত্রালাপ অবশ্য চলত। ব্যস্ত মানুষ। তবু পত্রের উত্তর পেতে দেরী হত না।

অজিত দাস : জন্ম ১৯২৭, কৃষ্ণগর। লেখাপড়া মেহেরপুর ও কৃষ্ণগর। পেশা ছিল শিক্ষকতা, অল্পবয়স থেকে সাহিত্যচর্চা করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভাগফল, ক্রৌঞ্চ নিষাদ (উপন্যাস) অজ্ঞাতবাস ও অন্যান্য গল্প (গল্প সংকলন), কাজী নজরুল ইসলাম— একটি অজ্ঞাত পূর্ব, জাতবৈষম্য কথা (প্রবন্ধ)

কৃষ্ণনাগরিক নারায়ণ সান্যাল এবং আমি

ড: নীরদবরণ হাজরা

নেই। সে বাড়িটা আজ আর নেই। ১৯৪৭-এ আমি কৃষ্ণনাগরে আসি। তখন পোস্টাফিসের মোড়ে লাল-বাড়ি বলতে যে বাড়িটাকে লোকে চিনত সেটি আজ আর নেই। প্রমোটারের প্রলোভনে সে বাড়ির উত্তরাধিকারীরা বিক্রি করে দিয়েছেন। বাড়ি ভাঙ্গাও হয়ে গেছে। ঐ বাড়িটাই ছিল নারায়ণ সান্যাল মশাই-এর পূর্বপুরুষের ভিটা। পরবর্তীকালে পাশের গলির মধ্যে যেতে ডানদিকে চতুর্থ কি পঞ্চম বাড়ি ছিল নারায়ণদার নিজস্ব বাড়ি। যেটি এখন তাঁর এক আত্মীয় শ্যামল সান্যাল কিনে নিয়েছেন। নারায়ণদার কোন মূল আর কৃষ্ণনাগরে নেই। এখন থেকে তিনি পুরোপুরি কলকাতার।

আমি প্রথম জীবনে নারায়ণ সান্যালকে চিনতাম না। কিন্তু আমার রীতিমত পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক ছিলেন নারায়ণ সান্যালের দাদা মানিকদা। ‘সংস্কৃতি সংসদ’ তখন শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। মানিকদা তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে একজন। আমি তখন লেখাপড়া ছেড়ে শুধু নাটক করেই বেড়াচ্ছি। এ সময়েই আমি মানিকদার মুখে প্রথম নারায়ণ সান্যালের সাহিত্যিক স্বরূপের কথা শুনি। ইঞ্জিনিয়ার ও মেধাবী ছেলের শৈখিন সাহিত্য-চর্চার প্রতি তখন আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। তখন আমাদের শেখানো হচ্ছে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মালে সৎ সাহিত্যচর্চা হয় না। তখন রবীন্দ্রনাথকে আমরা বুর্জোয়া কবি বলে তুচ্ছ করছি। আমাদের মুখে তখন শুধু গোর্কি, তুরগনিভ।

এই সময় কোনো ক্রমে আমার হাতে আসে একটা ছোটো নাটক। ভারি মজার এবং হাসির। নাম ‘মুস্কিল আসান’। পড়া শেষ করে নাম দেখে চমকে উঠি। নারায়ণ সান্যাল।

তখন হোমশিখার যুগ। কৃষ্ণনাগরের সাহিত্য চর্চায় হোমশিখার অবদান অস্বীকার করা যাবে না। সেই হোমশিখায় এক জনপ্রিয় উপন্যাস বের হচ্ছিল— ধারাবাহিক। সম্ভবত নাম ‘রাওয়াল’ প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষিতে রচনাটি। লেখক গোপালক মজুমদার। আমরা জানি সেটা নারায়ণদার ছদ্মনাম। এ নিয়ে একটা মজার ঘটনার কথা নারায়ণদার মুখে শুনেছি। তখন তিনি খ্যাত ও জনপ্রিয় লেখক। তাঁর অনেক উপন্যাস চিত্রায়িত হয়েছে। এ সময়ে ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। এবার স্ক্রামেই।

এর কিছু পরে ওঁর এক ভাগনের বিয়ে। মামা-গর্বে গর্বিত ভাগনে ফুলশয্যার রাতে নববধূকে সগর্বে মামার সম্পর্কে বলেন। বধূ অনেকক্ষণ শুনে গর্জে ওঠেন। থাম, তোমার মামার কথা আর বলো না। উনি তো অন্যের লেখা নিজের নামে চালান। সেদিন বহুকষ্টে ভাগনে মামার ইজ্জত রক্ষা করেন। এ গল্প বহুব্যার প্রিয় নারায়ণদার মুখে শুনেছি।

যা হোক, হোমশিখার যুগে নারায়ণদা কৃষ্ণনাগরবাসী ছিলেন। তখনই নারায়ণ সান্যালকে প্রথম চিনি। সে উন্নত দেহ গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় ধৃতি পাঞ্জাবিতে কৃষ্ণনাগরের পথে যেতে বহুব্যার দেখেছি; যাকে দেখলেই মনে হত দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক থেকে কোনো গ্রীক চরিত্র নেমে এসে ধূতি চাদর

পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে— তিনিই নারায়ণ সান্যাল। একটা কিছুই বিস্ময় বিমিশ্র শ্রদ্ধায় মনটা ভরে যেত। কাছে যেতে সাহস পেতাম না।

ইতিমধ্যে আমার জীবনে নানা পরিবর্তন এসেছে। আমি গণনাট্য সংঘ থেকে বিতাড়িত হয়েছি। নতুন করে কলেজে ভর্তি হয়েছি। অনার্স সহ বি. এ পাশ করেছি। বিবাহ হয়েছে। চাকরি করছি। এ সময়ে আমার লেখক সত্ত্বা সজীব হয়ে উঠল। আমি কিশোর-উপন্যাস লেখা শুরু করলাম। অচিরেই কিশোর ভারতীর জনপ্রিয় লেখক হয়ে উঠলাম। আমার আবৃত্তিকোষ-ভাষণকোষ ইত্যাদি গ্রন্থের আদিম রূপ ‘বাচনিক-রীতি-নীতি’ প্রকাশিত হয়েছে। তখন লেখা আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এতদিনে নারায়ণদার বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প, দণ্ডক-শবরী ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে তাঁকে খ্যাতির তুঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেছে। এসময়ে নারায়ণদার সঙ্গে আমার এক তীব্র সংঘাত হল। অবশ্যই মুখোমুখি না।

আমি নাটক নিয়ে গবেষণা করছি। গবেষণার প্রডাক্ট হিসাবে আমি রচনা করেছি ‘মঞ্চ আলোক-বিজ্ঞান ‘আলোকসম্পাত’। প্রকাশকের দোরে দোরে ঘুরি। সবার বাড়া চাল নেই। ‘না’ শুনলে চলে আসি। এমনি ভাবেই গোলাম ‘মণ্ডল বুক হাউস’-এর সুনীলবাবুর কাছে। আমার প্রস্তাব শুনে সুনীলবাবু বললেন, আমি বই করতে পারি। তবে কোনো এক্সপার্টকে দেখিয়ে নেব। আপনি পাণ্ডুলিপি রেখে যান। সাতদিন পরে আসবেন।

সাতদিন নয়। পনের দিন পরে গোলাম। সুনীলবাবু পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিলেন। না মশাই, আপনি ভুলভাল লিখেছেন। ভুলভাল? আমি বিস্ময়ে তাকলাম। পাণ্ডুলিপি নিয়ে দেখি, বিশেষ করে আলোতে রঙ এর মিশ্রণ অংশ, পরীক্ষক কেটে তছনছ করেছেন। আমি বললাম, না ছাপাবার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু আমার পাণ্ডুলিপি কাটবার ছাঁটবার অধিকার আপনাকে কে দিল? আমি পাণ্ডুলিপি নেব না। পাণ্ডুলিপি থাক। আমি কাল আসব। খানতিনেক ইংরাজি বই নিয়ে আসব। আমি দেখাব আমি ভুল লিখিনি। যে পরীক্ষককে দিয়েছিলেন তিনি আলোর ব্যাপারটা জানেন না। পিগমেন্ট কালারে রংয়ে রংয়ে যোগ হয়। আলোয় হয় মাইনাস।

পরদিন বই নিয়ে রণসম্মুখে সজ্জিত হয়ে গোলাম। আমাকে দেখেই সুনীলবাবু বললেন, আসুন আসুন। বই দেখাবার দরকার নেই। আমি আপনার বই ছাপব। আপনার তেজ দেখেই বুঝেছি, আপনি ভুল লেখেন নি। আমারই ভুল হয়েছিল। আমি এটা দেখতে দিয়েছিলাম এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে। নারায়ণ সান্যাল মশাইকে।

আমার মন সাংঘাতিক ভাবে নারায়ণ সান্যালের বিরোধী হয়ে উঠল। কিন্তু গুঁর বই-এর আকর্ষণ তীব্র। পেলে ছাড়ি না। শুরু করলে শেষ না করে উপায় নেই। গুঁর ‘রূপমঞ্জুরি’ প্রথম খণ্ড পড়ে যে কতদিন গুঁকে তাগিদ দিয়েছি দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য। তার ইয়ত্তা নেই।

যা হোক এতদিন পর্যন্ত নারায়ণ সান্যাল সম্পর্কে আমার মনের দ্বিচারিতার অভাব ছিল না। এমন সময় ইত্যাদি প্রকাশনীর আবির্ভাব হল। শিলাদিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে দেখা দিলেন নারায়ণ সান্যাল মশাই। সুধীর চক্রবর্তী মারফৎ নানা সংবাদ পাই। হঠাৎ একদিন সম্পাদকের বদল ঘটল। নারায়ণ সান্যালের স্থানে দেখা দিল সুধীরের নাম। একদা সুধীর মারফৎ আমার কাছে প্রস্তাব

এলো একটা শিক্ষামূলক পত্রিকা করবার। আমি অনেকদিন এমন একটা পত্রিকার পরিকল্পনা করছিলাম। বিশদভাবে লিখে সুধীরের হাতে পাঠিয়ে দিলাম। অচিরে আমার আহ্বান এলো। এবং কয়েক মাসের মধ্যে পত্রিকার লেখক গোষ্ঠী, লেখা সংগ্রহ ইত্যাদি পর্ব সেরে ঐ পত্রিকা বের হতে থাকল।

আমার পরিকল্পনামত প্রথম অংশ শুধু লেখাপড়া বিষয়ে এলেও শেষে একটা অংশ থাকত নানা বিষয়ে জ্ঞান প্রবর্তক লেখা। এই সূত্রে আমি প্রথম নারায়ণ সান্যালের মুখোমুখি হলাম।

কি অসাধারণ সুন্দর তাঁর স্টাডিরুম। সেখানে সেই টেবিলের দুপাশে বসে কথাবার্তা হল। নারায়ণদা খুব সহজেই মেনে নিলেন আমার দাবী। তখন ওঁর ‘না-মানুষের পাঁচালী’ গ্রন্থের রচনা-পর্ব চলছে। উনি ধারাবাহিকে প্রকাশের জন্য আমাকে ওঁর লেখার প্রথম অধ্যায় দিয়ে দিলেন।

কি বাকবাক্যে পরিচ্ছন্ন লেখা। আমি অনেকের পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়েছি। এত সুশ্রী চেহারা, পরিচ্ছন্ন পাণ্ডুলিপি কারো দেখিনি। শুনেছি রাজশেখর বসু খুব পরিচ্ছন্ন পাণ্ডুলিপি পাঠাতেন। তিনি বাড়িতে বাংলা রীতিতে কালি তৈরি করতেন। লেখা বাকবাক্য করত উজ্জ্বল্যে। কোনো অংশ কাটলে কাঁচি দিয়ে ঐ স্থানের মাপে কাগজ কেটে আঠা দিয়ে এঁটে, তার ওপরে সংশোধন অংশ লিখতেন। নারায়ণদা তা না করলেও ওঁর আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি তাঁর রচনার কোথায় কি পয়েন্ট সাইজ হবে তা থেকে ম্যাপ, চার্ট, ছবি সব এঁকে সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন। এ সুবিধা আর কারো লেখায় পাইনি।

‘ইত্যাদি’ প্রকাশনীর কর্মতৎপরতা প্রশংসনীয় ছিল। যেমন নিয়মিত বের হত পত্রিকা, তেমন নিয়মিত সাম্মানিক সংখ্যা ও সাম্মানিক অর্থমূল্য পৌঁছে যেত লেখক লেখিকাদের কাছে। এ সময়ে নারায়ণদার সঙ্গে আমার এক স্নেহকোমল সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ইত্যাদিতে কাজ করতে থাকাকালীন কিশোর-ভারতীতে প্রকাশিত আমার ধারাবাহিক উপন্যাস ‘রাম-রহিমের বন্ধু’ উদয়-প্রকাশন থেকে গ্রন্থাকারে বের হল। অনেকের সঙ্গে নারায়ণদাকেও একটি সংখ্যা পাঠালাম। ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় ওঁর ভাগনে সুবাস, যে ইত্যাদিতে কাজ করত, তার হাত দিয়ে আমাকে এক পত্র পাঠালেন। আমি আমার গ্রন্থ অনেককেই দিয়েছি। প্রশংসাও পেয়েছি। কিন্তু এমন পত্র পাইনি।

পত্রে তিনি আমাকে সম্বোধন করেছেন কৃষজাগরিক বলে। সঙ্গে ঐ সম্বোধনের একটা পূর্ব ইতিহাসও আছে। ওঁর সাহিত্য-চর্চার প্রথম যুগে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ওঁকে কৃষজাগরিক বলে সম্বোধন করেছিলেন। আজ সে ডাক আমায় ফিরিয়ে দিলেন। পড়তে পড়তে গা শিউরে উঠল। কি সুন্দরভাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করার সঙ্গে আমার ওপর দায়িত্ব তুলে দিলেন।

এরপর আমার গ্রন্থের সমালোচনা। মূলত আমার ভাষা, কাহিনীবয়ন দক্ষতা, সমাজ ও ইতিহাসবোধ সম্পর্কে অনুচ্ছসিত সংঘত আলোচনা শেষে একটা লাইনে শুধু লিখেছেন, ভায়া হে, তোমার উপন্যাসে ‘বাতাসি’ কাব্যে উপেক্ষিতাই থেকে গেল। ওঁর পত্র পেয়ে আমি অভিভূত হলাম। এর আগে পত্র পত্রিকায় আমার গ্রন্থ-সমালোচনা বেরিয়েছে। কিন্তু একজন নামী এবং জনপ্রিয় সাহিত্যিক আমাকে আমার বই সম্পর্কে পত্র লেখেননি।

তখন আমি ‘তিন রসিকের ত্রয়োম্পর্শ’ লিখছি। ‘গোপাল ভাঁড়’ অংশ উৎসর্গ করলাম

নারায়ণদার নামে, লিখলাম—

শ্রদ্ধাস্পদ নারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ) কে—

এক কৃষ্ণাগরিক,

তুলে দিলেন আর এক

কৃষ্ণাগরিকের হাতে।

এবার নারায়ণদা এক কথায় উত্তর দিলেন। সম্বোধন নেই, স্বাক্ষর নেই। শুধু ওর প্যাডের কাগজে লেখা ‘ব্রেভো’।

আমার ‘ইত্যাদি’ পর্ব শেষ হল। আমার শিক্ষক ড. ক্ষুদ্রিরামদাস আমাকে এ. মুখার্জির পাবলিকেশন ডাইরেক্টর নিযুক্ত করে দিলেন। সেখানে অদ্ভুতভাবে নারায়ণদা এসে পড়লেন আমার সামনে। আমাকে কতগুলি পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিতে বলা হয়েছিল। কর্তারা ঐগুলি ছাপতে চান না। তার মধ্যে একটা দেখি নারায়ণ সান্যালের পাণ্ডুলিপি। পয়োমুখম্। কালকূট নামে সমরেশ বসু লিখেছিলেন অমৃতকুন্ডের সন্ধানে, সেই গঙ্গা, নিয়েই নারায়ণ সান্যাল লিখেছেন— পয়োমুখম্— পয়ঃ শুধু মুখেই আর সবটুকু কালকূট। গঙ্গাদূষণ নিয়ে অসাধারণ লেখা। এটা ফেরৎ দেব! আমি গোলাম কর্তাদের কাছে। বললাম নারায়ণদার লেখা প্রকাশক পায় না, আর আপনারা পেয়ে ছেড়ে দেবেন। এই লেখা কি আপনারা পড়েছেন?

ওঁরা আমার কথায় আপত্তি করলেন না। নারায়ণদার বাড়িতে গিয়ে কন্ট্রাক্ট করা হল। নারায়ণদা পুস্তানি থেকে ভেতরের সব ছবি, ম্যাপ নিজে ঐকে দিলেন। এই উপলক্ষ্যে কয়েকবার ওঁর বাড়ি গেলাম। ক্রমে নারায়ণদার ঘনিষ্ঠ ও স্নেহের অংশভাগী হয়ে উঠলাম। এ সময়ে পয়লা বৈশাখ বার বার এ. মুখার্জির দপ্তরে, দেজ-এর দপ্তরে আরও অন্য দপ্তরে দেখা হত। দেখা হলেই আমার কৃষ্ণগরী ভাই বলে টেনে পাশে বসাতেন।

আমার ‘শুনুন ধর্মাবতার’ বের হচ্ছে। এ বই প্রকাশ করতে বহু প্রকাশক ভয় পেলেন। ও, বাবা গান্ধি হত্যাকারীর জবানবন্দী। যদি কংগ্রেসী হামলা হয়। এক পাঁড় কংগ্রেসী ছোটো প্রকাশক চাইলেন ও বই বের করতে। বই প্রকাশের আগে থাকতে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে সে বাজার সরগরম করে তুলল। স্থির হল গোপাল গড়সেকে এনে বইমেলায় উদ্বোধন হবে। বিজ্ঞাপন বের হতে থাকল। কিন্তু আমি ঘুরে ঘুরে কাউকেই সভাপতি হতে রাজি করাতে পারলাম না। অন্ত্যায়ের দিনের কাগজে স্থান, সময় সব বিবরণ থাকল। শুধু সভাপতির নাম ঘোষিত হল না। প্রকাশক বললেন, কি হবে দাদা!

আমি বললাম, সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘাবড়িও না।

তখনও জানতাম না যে আমাকে বাঁচাতে স্বয়ং নারায়ণদা এগিয়ে আসবেন।

তখন বেলা তিনটে-সাড়ে তিনটা বাজে। আমি পাগলের মতো মেলায় পথে পথে ঘুরছি। যদি কাউকে পেয়ে যাই, যিনি সভাপতি হতে রাজি হন। এ সময়ই ধূলিধূসরিত পথে দেবদুতের মতো আবির্ভূত হলেন নারায়ণ সান্যাল। আমাকে দেখেই সহাস্যে এগিয়ে এসে বললেন, কি হে! মুখ কালো কেন? গোপাল গড়সে আসে নি?

আমি বললাম, না দাদা, তিনি দুমাস আগে এসেছেন। তাঁর অনুরাগী শুভানুধ্যায়ীদের বাড়িতে

আছেন। তিনি বলেছেন তিনি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবেন। আগে গেলে সাংবাদিক উৎপাতে টিকতে পারবেন না।

নারায়ণদা বললেন, আজ মেলায় এসেছি তোমার ঐ সভা শুনব বলে।

আমি বললাম, শুধু শুনলে তো হবে না দাদা। আপনাকে আর একটু কাজ করতে হবে, আপনাকে ঐ সভার সভাপতি হতে হবে।

নারায়ণদা বললেন, কেন? সভাপতি আসতে পারবেন না?

না, কেউ সভাপতি হতে রাজিই হন নি।

বেশ আমিই ঐ সভার সভাপতি হব। আমিও যথাসময়ে তোমার সভায় উপস্থিত হব। এই বলে নারায়ণদা চলে গেলেন।

আমি দৌড়ে গেলাম প্রকাশকের কাছে। নারায়ণদার সম্মতির কথা বললাম। প্রকাশক খুব খুশী।

সভামঞ্চে যখন গেলাম তখন আমার সভারস্ত্রে নির্দ্ধারিত সময় পার হয়ে গেছে। আগের প্রকাশক সময় নিয়েছেন বেশি। আশ্চর্য, সভায় কেউ নড়ল না। সবাই বসে পড়ল। পরে বুঝলাম আমার সভার জন্যই ভিড়। আগের প্রকাশকের দর্শক বা শ্রোতা এঁরা নন। আরো একটা মজা দেখলাম। সাংবাদিকে সাংবাদিকে ছয়লাপ। সবাইকারই প্রশ্ন গোপাল গডসে এসেছেন? আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁর ঠিকানা দিতে, তাঁর একটা নিভৃত সাক্ষাতের আয়োজন করে দিতে। সম্ভবত এ আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই গডসে আমাদের আশ্রয়ে থাকেননি। আমাকে ঠিকানাও জানান নি।

প্রায় ছটায় সভা শুরু হলো, নারায়ণদাকে সভাপতিত্বে বরণ করা হল। কিন্তু গোপাল গডসের দেখা নেই। আশ্চর্য, এক সময়ে তাঁর আবির্ভাব। তাকে প্রধান অতিথির আসনে বরণ করা হল। এ গ্রন্থ কিভাবে কেন অনুবাদ করলাম তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে আমি সভামঞ্চে ছেড়ে একটু বাইরে এলাম।

বাইরেও সাংবাদিকরা ঘিরে ধরলেন। একটু সুযোগ করে দিন। আমি বললাম, গডসে ভারী সেয়না। ও ইন্টারভিউ দেবে না।

ভেতরে গডসে দারুণ বক্তৃতা দিলেন। আমার ভয় ছিল কটর হিন্দু পন্থী গড়নে এমন বক্তৃতা না দেয় যাতে সাম্প্রদায়িকতা এঁকে দেওয়া হয়। ওর বক্তৃতায় নারায়ণদাও খুশি।

নারায়ণদা প্রায় একঘণ্টা বললেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস, বিদজ্ঞানের ভ্রান্তি, আজকের রাজনীতির ঘোলাজল, দেশপ্রেম, কর্তব্য, নাথুরামের এ গ্রন্থ কেন প্রয়োজন ইত্যাদি নানা বিষয়ে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা। এ যেন অনেক নিষ্ঠায় প্রস্তুত হয়ে আসা এক বক্তৃতা।

নারায়ণদার বক্তৃতার মাঝে গডসে অদৃশ্য হয়েছেন। সভা শেষে সাংবাদিকেরা ঘিরে ধরলেন নারায়ণদাকে। আমার প্রকাশক কিছু খাবার প্যাকেট করেছিল। সেগুলো বিলানো শুরু করল। এরমধ্যে গিল্ডের কর্তারা নারায়ণদাকে নিয়ে গিয়ে তুললেন দোতলাতে ওদের নিজস্ব হলঘরে। আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি পৌনে আটটা। সর্বনাশ শেষ গাড়ি ছাড়া ফিরবার গাড়ি সব চলে গেল। আমি ঠেলে ঠুলে নারায়ণদার কাছে গিয়ে বললাম, দাদা আমায় তো যেতে হবে।

হ্যাঁ ৮টা ৪২-এ শেষ গাড়ি। তুমি যাও।

আমি বললাম, আমার প্রকাশক আপনাকে গাড়ি করে দেবে। আপনি তাতে চলে যাবেন। না, না। গাড়ির দরকার নেই। আমার জন্য ভেবো না। আমি ঠিক চলে যাবো।

আমি চলে এলাম। পরদিন সব পত্রিকাতে বড়ো করে সংবাদ বের হল। যদিও গোপাল গডসেকে হাইলাইট করা হয়েছে, তবু শুনুন ধর্মাবতার উপেক্ষিত হয়নি। পড়তে পড়তে উল্লসিত হলাম। কিন্তু তার পরেই এক সংবাদে চমকে উঠলাম, সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল অসুস্থ।

কলকাতায় গিয়ে আরো শুনলাম, নারায়ণদা রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে (তখন রবীন্দ্রসদনের সামনের মাঠে বইমেলা হত) রাস্তার ওপর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। এক পাঞ্জাবী দম্পতি তাকে চিনতে পেরে ট্যাক্সিতে তুলে তার বাড়িতে পৌঁছে দেয়। তার এক আত্মীয় ডাক্তার। তিনি তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করে দেন। একটা অপরাধ বোধ আমায় ঘিরে ধরল। কিন্তু সব আশঙ্কা দূর করে তিনি অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। সে সংবাদও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এর মাসখানেক পরে জেলা গ্রন্থাগারে নারায়ণদার একটা নতুন বই হাতে পড়ল। ‘আবার সে এসেছে ফিরিয়া’ — আশ্চর্য, শুনুন ধর্মাবতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে গ্রন্থের সূচনা হয়েছে। ‘কৃষ্ণাগরিক ভায়া নীরদ’ বলে আমার উল্লেখ। আশ্চর্য, জীবনের অতি সাধারণ ঘটনাকে এমন উপন্যাসের আকার দেওয়া যায়!

এরপর আমার জীবনে এক কালো অধ্যায় আসে। আমি এক ব্যক্তির টোপে পড়ে নবম-দশমের মতো আর এক পত্রিকা করতে যাই। আর সেজন্য নারায়ণদার কাছে একটি ধারাবাহিক রচনার দাবি জানাই। তিনি হাসিমুখে আমাকে একটা পাণ্ডুলিপি ও ছবির গুচ্ছ ধরিয়ে দেন। পত্রিকা প্রকাশিতও হয়। কিন্তু তিনবার সংখ্যা বের হতে না হতে ভদ্রলোক অত্যন্ত অভদ্রভাবে আমাকে অফিস থেকে তড়িয়ে দেন। নারায়ণদার লেখা আর উদ্ধার করতে পারিনি। ঐ অর্থ সরবরাহকারী নারায়ণদার লেখক-সাম্মনিকও দেয়নি। আমি সব অবস্থা জানিয়ে নারায়ণদাকে এক পত্র দিয়ে নিজের কঠোর জীবনসংগ্রামে ব্রতী হই। সম্ভবত ডাকের বিঘাটে সে চিঠি নারায়ণদা পান নি। তিনি আমার প্রতি এত চূড়ান্ত বিরূপ হন যে দেখা হলেও না-চেনার ভান করে এড়িয়ে যেতেন। দেজ প্রকাশনে পয়লা বৈশাখ দেখা হলে আর কথাই বলতেন না। ওঁর গাভীর এড়িয়ে আমি আর কথা বলতে সাহস পেতাম না।

ওঁর ১০১ ও ১০২ নং গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষে দেজ প্রকাশন স্টুডেন্টস হলে এক সভার আয়োজন করে। সে সভায় আমার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এরপর নারায়ণদার বিরূপতা কেটে যায়। উনি স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণগরে ‘নেতাজী ভবনে’ এক অনুষ্ঠানে এসে আমাকে ওঁর পাশে ডেকে নিয়ে আবার প্রীতি ছড়িয়ে দেন। আমার সব কুণ্ঠা দূর হয়। সেই ওঁর সঙ্গে আমার শেষ কথাবার্তা।

এরপর নারায়ণদার সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয়নি। হেম বাগচির জন্মশতবর্ষে ওঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু স্ত্রী অসুস্থ থাকায় তিনি আসেন নি। এরপর আমি ক্রমেই অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকি। তারই মধ্যে কলকাতা গেলেও নারায়ণদার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেনি। শুধু আর্টিস্ট দিলীপ দাসের বাড়িতে টিভিতে ওর লেখা এক গ্রন্থের চিত্ররূপে ওঁকে অভিনয় করতে দেখি।

মানুষটা কত গুণেই না গুণী।

২০০৪-এর শেষদিক থেকে আমাকে আমার পুত্র একের পর এক নার্সিংহোম আর ডায়গনস্টিক সেন্টারে ঘোরাচ্ছে। অবশেষে A.M.R.I-এ হল এক মস্ত অপারেশন। অপারেশনের পর বায়প্লি-র রিপোর্টে জানা গেল ক্যান্সার নয়। ক্রমে সুস্থ হলাম। সেখানেই একদিন পত্রিকায় দেখলাম নারায়ণদা প্রয়াত হয়েছেন।

বাইরে এসে জানলাম বইমেলায় একসময় ঘুরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই তার মৃত্যু হয়।

পত্রিকা সম্পাদনার দৌলতে বহু সাহিত্যিকের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়, সুনীল গঙ্গুলী... এবং আরো অনেকের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু কারো সঙ্গেই এতটা স্নেহ-প্রীতির আত্মীয় সম্পর্ক ছিল না। তাই এ প্রবন্ধে আমি নারায়ণ সান্যালের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করলাম না। মানুষ নারায়ণ সান্যালই আমার আলোচ্য বিষয়। কৃষ্ণগর ত্যাগ করে কলকাতাবাসী হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কৃষ্ণগর ছিল তাঁর মজ্জায়। কৃষ্ণগরে প্রথম যখন আমি আসি, তখন জনসমাজে এক সৌম্য রসিকতার প্রবণতা দেখেছি। নারায়ণদার মধ্যে সেই উত্তরাধিকার ছিল। তিনি ছিলেন খাঁটি কৃষ্ণাগরিক।

তাঁর প্রয়াণে কৃষ্ণগরের সেই প্রবণতার সম্ভবত শেষ প্রতিভূ চলে গেলেন। আর আমি হারালাম আমার এক সমর্থক ও প্রীতির আশ্রয়কে।

তাঁর আত্মা শান্তিধামে বিরাজ করুক। দাদা বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না, সে ধামে আমরাও অচিরে যোগ দেব।

ড. নীরদবরণ হাজরা : প্রখ্যাত সাহিত্যিক, কৃষ্ণাগরিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : শুনন ধর্মাবতার (অনুবাদ), আবৃত্তি কোষ, মধ্যে শব্দ ও আলোক, কর্নেল টড-এর রাজস্থানের রাজকাহিনী, রাম রহিমের বন্ধু (কিশোর উপন্যাস), ইত্যাদি।

নভেলিস্ট

সুধীর চক্রবর্তী

তখন স্কুলে পড়ি— নারায়ণদাস সান্যাল নামটি প্রথম শুনি, উঁহু শুনি নয়, পড়ি ছাপার অক্ষরে। কৃষ্ণনগর কলেজ পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক হিসাবে নামটি মুদ্রিত ছিল। পত্রিকার ভেতরে ছিল ম্যাথমেটিশিয়ানের বকলমে একটা কবিতা এবং এবং একটা গল্প, যার নাম $C+O_2=CO_2$ । একেবারে চমকে গিয়েছিলাম লেখা দুটি পড়ে। আসলে তখন নারায়ণদাস সান্যাল কলেজে বি. এস.সি পড়তেন। এক দশকের পরে ঐ কলেজের ঐ পত্রিকাতেই আমি হব সম্পাদক— নাম ছাপা হবে ঐতিহ্যবাহী সম্পাদক পঞ্জিতে এসব তখন কি জানতাম? জানতাম না এটাও যে শহরের মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত লালবাড়ির (যা এখন ভূমিসাং) ছোট ছেলে, সুদর্শন, গৌরবর্ণ, ইঞ্জিনিয়ার নারায়ণদাস সান্যাল একদিন হবেন সর্বজনপ্রিয় লেখক নারায়ণ সান্যাল, এমনকী হবেন আমার নারায়ণদা। কিন্তু সেটা অনায়াসে হল যখন, তখন পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি। আমি তখন কলেজ পাঠের শেষধাপে। নারায়ণদা নদিয়াতেই বাস্তবিকদের সরকারি চাকুরে— কৃষ্ণনগরেই থাকেন— লেখালেখি করেন। দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সূত্র ছিল ‘হোমশিখা’ নামে একটি মাসিক পত্র যেখানে বসত নিয়মিত সাহিত্যিক আড্ডা। আমি তার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। অগ্রজ সাহিত্য পথিকের প্রতি তখন আমার ছিল অটল বিশ্বাস, যদিও আমার নিজস্ব সাহিত্য প্রতীতি কিঞ্চিৎ ভিন্ন বাঁকে বইতে শুরু করেছে। আমি তখন গভীর আগ্রহে বুদ্ধ দেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পড়ে আধুনিকতায় দীক্ষিত হচ্ছি— তাতে নিরন্তর মুদ্রিত হচ্ছে জীবনানন্দ, বুদ্ধ দেব, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অমিয় চক্রবর্তী, অরুণকুমার সরকার। নরেশ গুহ-র কবিতা বা কবিতা বিষয়ে বুদ্ধ দেবের মায়াবী গদ্য। নারায়ণদা তখন ‘হোমশিখা’-র আসরে আওড়াচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্রদেব বা নজরুলের কবিতা। ছোটো মফস্বলের সনাতন সাহিত্যাদর্শে মার্ক্সবাদী লেখকরা হলেন নিন্দিত। উত্তর রৈবিক ভাবধারায় স্নাত ‘হোমশিখায়’ কবিতা লিখতেন নরেন্দ্রদেব, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক আর বিজয়লাল বা করুণানিধানরা। আমি সেই মধ্যযুগীয় পত্রিকায় জীবনানন্দ-র মৃত্যুতে (১৯৫৪) লিখে বসলাম এক বেদনার্ত সম্পাদকীয়। নারায়ণদা তা পড়লেন, তারিফ করলেন কিন্তু আড়চোখে তাকিয়ে বুঝতে ভুল করলেন না যে মফস্বলবাসী এই ছোকরা আনপথের পদাতিক। বস্তুত আমি তখন এলিয়ট, স্পেন্ডার, হপকিন্স, অডেন ও সি. ডে. লুইসে হাবুডুবু খাচ্ছি, মুগ্ধ হচ্ছি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র কাব্যকল্পে, নকল করছি তাঁর ত্রিা্যাপদহীন গদ্যের। হোমশিখার দল আমাকে বলে চলেছেন, ‘কী সব আধুনিক কবিতা পড়ছ। কিছুই যে বুঝি না।’ অতটা প্রকাশ্যে হয়তো নয়, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে নারায়ণদা আমার বিরোধী দলেই ছিলেন।

কিন্তু তাতে ঘনিষ্ঠতায় অসুবিধে হয়নি, স্নেহবর্ষণে কিছুমাত্র কমতি ছিল না। গোনাগুণতি একেবারে দশ বছরের ছোটো এই বঙ্গ সাহিত্যপাঠী ছাত্রটিকে নিজের ওদার্যে বানিয়ে নিয়েছিলেন অনুজপ্রতিম— বরাবর সেই অনুজের প্রতি স্নেহমিশ্রিত একটা আস্থা ছিল। গোড়ার দিকে সব উপন্যাসই পাণ্ডুলিপি স্তরে পড়তে দিতেন। মাঝে মাঝেই লাল বাড়ির অব্যবহৃত বাইরের ঘরের

ধুলো বেড়ে আমাকে সামনে বসিয়ে পড়ে শোনাতেন সদ্যতম লেখাটি— আকুল চোখে মত-মন্তব্য চাইতেন। ততদিনে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়িয়েছি। নারাণদাও বদলি হয়ে চলে এসেছেন সদর স্ট্রিটের অফিসে। যোগাযোগ তাতে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। আমি সময় সুযোগ পেলেই ইউনিভার্সিটি থেকে টুক করে কেটে পরে ট্রামে চড়ে চলে যেতাম এসপ্লানেডে। সেখান থেকে হেঁটে জাদুঘরের পাশেই সদর স্ট্রিটে নারাণদার উদ্ভাসিত সফল আননটি দেখা।

সফলই তো। নারায়ণ সান্যালের মতো সফল সচ্ছল সাবলীল মানুষ আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। তাঁর সান্নিধ্যের প্রায় সব স্মৃতিই ভারি মনোরম আর মাধুর্যে ভরা। হয়তো গাড়ি করে নিয়ে গেলেন সেই সার্কুলার রোডে জিমিস কিচেনে— খাও পোট পুরে চিনে খাবার। চলো কলেজ স্ট্রিটে বইপাড়ায় আড্ডায়। চলো নিউ আলিপুরে জরাসন্ধ-র সঙ্গে গল্প করে আসি। চলো ইন্দ্র দুগারের ছবির প্রদর্শনী। সবটাকেই একটা রোমান্টিক মেজাজ এবং প্রচ্ছন্ন অভিজাত্য। আর কি তুখোড় বুদ্ধি এবং রসরসিকতা। অভিজ্ঞতাই বা কম কি! শুধু দণ্ডকারণ্যের অভিজ্ঞতা শুনতে শুনতেই কত সময় কেটে গেছে।

এখন এতদিন পরে, মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষনীতে মনে হচ্ছে, নারাণদা ছিলেন জীবনরসিক এবং শিল্প সাহিত্যপ্রেমী। বস্তুত লিখতে এত ভালবাসতেন যে তার প্রমাণ শতাব্দীর্ণ নাকি একশো পঁচিশেরও বেশি বইয়ের সংখ্যা আর সেইসব বই লেখার জন্যে বিপুল পাঠের পূর্ব প্রস্তুতি, নোট্‌স তৈরি করা। এক কথায় তিনি বাংলা কথা সাহিত্যের একজন মেধাবী লেখক ছিলেন। অনুবাদে চোস্ত, অন্য বিদেশী বই আত্মীকরণে দক্ষ, স্বদেশী সাহিত্যের মগ্ন পাঠক। তাঁর লেখার পরতে পরতে আছে কৃষ্ণগরুর কথার ভাঁজ এবং মেধা ও মননের দ্যুতি। পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু তার ভার নেই। কলকাতায় ২৪ নম্বর চৌরঙ্গি রোডে একজন আশ্চর্য মানুষ আছেন (এখন ৮৫ বয়স) তাঁর নাম আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত তাঁর বাড়ির সংলগ্ন ঘরে একটা ক্লাব ছিল যার নাম ‘কথাকলি’— নাটক আর গানবাজনার বিনোদনে মশগুল কটি মানুষের সংস্থা। তাতে নারাণদা তো ছিলেনই, তবে মধ্যমণি ছিলেন নতুদা (নরেন্দ্র কুমার মিত্র) আর ছিলেন তাঁর ভাই বাকাদা। সবাই কৃষ্ণাগরিক কিন্তু জীবিকার টানে কলকাতার বাসিন্দা— যেমন গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়। একদিন এই সব কৃষ্ণাগরিকদের মধ্যে আমিও হাজির হতে আনন্দগোপাল বললেন, ‘নাঃ, ক্লাবের নামটা এবার পান্টাতে হবে দেখছি। কথাকলি নামটা বদলে করা হোক কৃষ্ণকলি।’ সেই থেকে কৃষ্ণকলি নামটা বেশ চালু হয়েছে। মানবাধিকার কমিশনের সদ্যপ্রয়াত চেয়ারম্যান মুকুল গোপাল মুখোপাধ্যায় একজন কৃষ্ণকলি। আর এক বিখ্যাত কৃষ্ণকলি হল আমার বন্ধু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

নারাণদা ছিলেন আদ্যন্ত কৃষ্ণকলি। গোয়াড়িগঞ্জের রসবোধ আর কলকাতার সফিস্টি কেশ্যন নারাণদার কথাবার্তায়, হাঁটাচলায়, আচরণে এবং লেখায় খুব স্পষ্ট। কিন্তু সবচেয়ে যা আমাকে চমৎকৃত করেছে তা হল নারাণদার সৌজন্য আর আভিজাত্য। তাঁকে জন্ম সূত্র থেকে উচ্চ মধ্যবিত্ত বলা যাবে না। ধনী সন্তান বলাই উচিত। তাঁর পিতা ছিলেন বাস্তবিদ। ছেলেকেও তাই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আসলে নারাণদার ছিল জন্মগত বহুমুখী প্রতিভা। লালবাড়িতে তাঁর আঁকা জলরঙের একটা সেক্সি পোর্ট্রেট দেখে জিগ্যেস করেছিলাম, এটা কিভাবে আঁকলেন নারাণদা?

— কেন? আয়নায় মুখটা দেখে দেখে।

যাকে বলে ন্যাচারাল আর্টিস্ট ছিলেন। সবকিছুর স্কেচ করতে চাইতেন। অজস্র চিত্রাবলি থেকে ওড়িশার মন্দির স্থাপত্য কিংবা বস্তারের আদিবাসী নরনারী। কিন্তু রেখায় কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল। প্রথাগতভাবে চর্চা করলে রেখার টান গভীর হত। কিন্তু সময় পাননি। খুব ত্বর ছিল সব কাজে— লেখাতেও রেখাতেও। একটানে লিখে উপন্যাস নামিয়ে দিতেন। আর একটু থিতু হতেন যদি।

না না, তাঁর বিন্দুমাত্র সমালোচনা করা হবে আমার পক্ষে গর্হিততম অপরাধ— প্রয়াত মানুষের সমালোচনা সৌজন্যবিরোধী। কে না মানবে যে নারায়ণ ছিলেন সৌজন্যের ফলিত নমুনা। তার একটা ছোট উল্লেখ করি। একবার ডাকে একটা চিঠি এল— লেফাফায় ভরা হাতের লেখায় মালুম হল নারায়ণদার চিঠি। তখন তো এত টেলিফোনের চল হয়নি— আমার টেলিফোনই ছিল না— তাই চিঠি। ওঁর যন্ত্রস্থ উপন্যাস ‘অল্লীলতার দায়ে’ বইটা আমাকে উৎসর্গ করতে চান, তাই আমার সম্মতি চেয়ে চিঠি। পড়ে সে উর্ধ্ববাহু দশা আমার। নারায়ণদা আমাকে বই উৎসর্গ করবেন? কি আনন্দ? কিন্তু তার জন্যে বুঝি প্রাপকের সম্মতি লাগে? জনতাম না। সানন্দে সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিলাম। তারপরে দিনদশেক পরে ডাকযোগে বইটা এল। কৃতজ্ঞতা জানাতে কলকাতা গিয়ে নারায়ণদার সঙ্গে দেখা করে জিগ্যেস করলাম, ‘নারায়ণদা কাউকে বই উৎসর্গ করতে হলে বুঝি তার সম্মতি লাগে?’

— হ্যাঁ। জানতে না? এটাই প্রথা এবং তার যুক্তিও আছে।

— যুক্তিটা কী?

— ধরো, আমি বলে বলছি না, কিন্তু একজনের তো অন্যজনের সম্পর্কে কোনো আপত্তি থাকতে পারে। সে বলতেই পারে আপনি কেন আমার নামে বই উৎসর্গ করলেন? ঠিক আছে। বই দিন কিন্তু সম্মতি আছে কিনা জেনে নেওয়া উচিত ছিল।

বিনা খরচে নারায়ণদার কাছে সৌজন্য শিখে নেওয়া গেল। তাঁর কাছে কয়েক দশক ধরে শিখেছি তো অনেক কিছুই। কোন্টা ছেড়ে কোন্টা বলি। ঠিক আছে, প্রথমে ক্রিকেট খেলা দেখার গল্পটাই বলি। তার আগে পাঠকদের জানানো দরকার যে নারায়ণদা ছাত্র জীবনে ভাল ক্রিকেটার ছিলেন এবং এই অধম ছিল ক্রিকেটের পোকা? কলেজ জীবন পর্যন্ত খেলেছি তো বটেই, দেখেছি অন্তত গোটা তিরিশেক আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সে। আম্পায়ারিং করেছি ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশ কবার আর এখন কবুল করতে লজ্জা নেই যে লাঞ্ছনের সময় দুপক্ষের দুদফা পাউরুটি-আলুরদমের লোভে অন্তত একশো ম্যাচের স্কোর লিখেছি কৃষ্ণনগর কলেজের সেই বিখ্যাত প্যাভেলিয়ানে। কাজেই নারায়ণদা যখন আমাকে কলকাতা টেস্টে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানানেন, (তখন আমি অধ্যাপক) আমি তাঁর নির্দেশমত খুব ভোরে উঠে, ৪ টে ৫০-এর ট্রেন ধরে, ট্যাক্সি নিয়ে তাঁর চক্রবেড়িয়া রোডের বাড়িতে পৌঁছে গোলাম সাড়ে আটটার মধ্যে। দশটা পনেরোতে ইডেনে প্রথম ওভার শুরু হবে। আমি তো তৈরি কিন্তু নারায়ণদা দিব্যি পাজিমা-গোঞ্জি পরে আড্ডা মেরে যাচ্ছেন। কী ব্যাপার? টিকিট পাননি নাকি। তা কি করে হবে? সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পশ্চিম মবঙ্গ সরকারের, ইডেন তো ওঁদেরই রক্ষণাবেক্ষণে। তবে?

চা জলখাবার খেতে খেতে ঘড়ির কাঁটায় সাড়ে নটা। নারায়ণদা বললেন, বোসো রেডি

হয়ে নিই। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে এলেন প্যান্ট শার্ট পরে। বসলেন মৌজ করে সোফায়। বউদিকে বললেন, দুকাপ কফি প্লিজ। ঘড়িতে পৌনে দশ। আমি ছটফট করছি। হায়, এখনও যদি গাড়িতে রওনা হই তবু তো আধঘন্টা ... রাস্তায় জ্যাম। ইস্ খালার শুরুটা দেখা হবে না।

দশটা চোদ্দ। নারাণদা উঠে টিভি খুলে দিলেন। বললেন, আজকে আমরা টেস্ট ম্যাচ দেখব ঘরে বসে গদিয়ানি চালে। এখানেই কিন্তু নাটকের শেষ নয়। ঘড়ি ধরে লাঞ্চ আওয়ারে লাঞ্চ খাওয়া হল : স্যাণ্ডুয়িচ, কাবাব, ফ্রুট সালাড, ফিস ফ্রাই আর আইসক্রিম। তারপরে ওয়াটার ব্রেকে ফলের রস, টি টাইমে টি। অবশেষে খেলা শেষ নারাণদার অনবদ্য নাটকও শেষ।

এই নাটকীয়তা ছিল তাঁর রক্তে। যখন বি.ই কলেজে পড়তেন, ‘মুন্সিল আসান’ বলে একটা নাটক লিখে সহপাঠীদের দিয়ে এবং নিজের অভিনয় করেছিলেন। ‘মুন্সিল আসান’ই সম্ভবত তাঁর প্রথম ছাপা বই— তার অনেক পরে বেরোয় ‘বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প’— তখন তাঁর কৃষ্ণনগর ‘হোমশিখা’ পর্ব চলছে। তার পাণ্ডুলিপির অন্যতম প্রথম শ্রোতা আমি। এইখানে এসে তাঁর নাটুকেপনার আর একটা নমুনা বলি।

সে সময়ে নারাণদা ধুবুলিয়া গয়েশপুর চামটা এসব নানা উদ্ধাস্ত কলোনিতে ঘুরে সরকারি কাজ করতেন জিপে চড়ে। ‘হোমশিখা’-র আড্ডায় অফিস ফেরৎ নামতেন মাঝে মাঝে। তবে শনি রবিবারে তাঁর উপস্থিতি ছিল অবধারিত। একবার এসে বললেন, ‘ডাকে নতুন লেখা কিছু কি এল?’ ব্যাপারটা দেখতাম আমি। কিছু খুচরো কবিতা আর গল্প বাদে সে সপ্তাহে এসেছিল ঢাউস একটা খামে ভরা একটি নতুন উপন্যাসের প্রথম দু-তিন কিস্তি পাণ্ডুলিপি। মনোনীত হলে ধারাবাহিক ছাপা যেতে পারে, লেখক গোপালক মজুমদারের চিঠিতে সে কথা লেখা। ‘দেখি দেখি?’ নারাণদা আগ্রহ ভরে লেখাটি নিলেন। এটা সত্যি যে সেই সময়ে ‘হোমশিখা’-য় একটি ধারাবাহিক উপন্যাসের চাহিদা ছিল কিন্তু জোগান ছিল না। নারাণদাকে সম্পাদক ননীদা (ননীগোপাল চক্রবর্তী এ বছর তাঁর শতবর্ষ) অনুরোধ করেছিলেন, ‘নারাণ তোমার এত সুন্দর লেখার স্টাইল, একটা উপন্যাস ধরো, আমি ছাপব হোমশিখায়।’ শুনেই নারাণদা বললেন, ‘খ্যুস। আমি কি নভেল লিখতে পারি? ছুটকো একটা দুটো কবিতা, ছড়া, কার্টুন— বড়জোর একটা গল্প তাছাড়া সময় কই? সরকারি কাজের যা উদয়াস্ত ছড়কো— ট্যুর ট্রাভেল অফিস প্লাস রিপোর্ট লেখা— না না, ননীদা আপনি কলকাতার কাউকে ধরুন।’

সেই রকমই ভাবা হচ্ছে, ননীদা ভাবছেন কলকাতা যাবেন একবার— এমন সময় ‘না চাহিতেই জল’। ডাকযোগে নতুন উপন্যাস এবং নতুন লেখকের, সঙ্গে পরবর্তী কিস্তি পাঠানোর অঙ্গীকার। উপন্যাসের নাম : ‘রাওয়াল’। পটভূমি আঠারো শতকের রাজস্থান— ঐতিহাসিক নভেল। সবাই গোল হয়ে বসলাম— ননীদা পড়তে লাগলেন। বেশ জমাটি লেখা— নারানদা একপ্রস্থ মুড়ি, তেলেভাজা খাওয়ালেন, সম্পাদক খাওয়ালেন দু-তিন রাউন্ড চা। তিন কিস্তি পড়তে সময় লাগল ঘন্টা খানেকের বেশি। সবাই খুশি। নিশ্চিত। সবচেয়ে উচ্ছসিত নারাণদা! ততদিনে আমাদের বেশ জানা হয়ে গেছে, নারাণদা ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠে যাকে বলে রাজা। দেশী বিদেশী রোমান্সের নভেল তাঁর জিহ্বাগ্রে— শরদ্দিন্দুর পাঁড় ভক্ত। কিন্তু ‘রাওয়াল’-র লেখকের নামটা অদ্ভুত গোপালক মজুমদার। তার চেয়েও অদ্ভুত লেখকের ঠিকানা: C/o অপ্রকাশ গুপ্ত।

কিনু গোয়ালার গলি। কলকাতা নয়। বোম্বাই গেল ছদ্মনাম। হাতের লেখাটা একটু কেমন যেন। যাইহোক, শুরু হল হোমশিখার এক নতুন পর্ব। ঠিক সময়ের ব্যবধানে কিস্তি আসে— আমরা গোল হয় বসে পড়ি— ছাপা হয়। প্রবল উত্তেজনা। পাঠকদের চিঠি... প্রশ্ন ... মাঝে মাঝে মালিকের কাছে ফোন আসে ‘কে মশাই এই গোপালক মজুমদার? চালিয়ে যান।’

সত্যিই চালিয়ে গেলেন গোপালক এক-দেড়বছর কি তার বেশি। নারাণদা লেগে পড়লেন গোয়েন্দার মতো। উৎসাহ তাঁরই সমধিক। তাঁর প্ল্যানমাফিক একটা উৎসবের পরিকল্পনা হল— সাহিত্যসভা— কৃষ্ণগরের রাজবাড়িতে। ‘হোমশিখা’-য় বিজ্ঞাপিত হল। গোপালক চিঠি লিখে জানালেন তিনি সশরীরে আসবেন। আমরা উত্তেজিত। সভানুষ্ঠানের সকালে বেলা দশটা নাগাদ হোমশিখা কার্যালয়ে এলেন এক অচেনা ভদ্রলোক। বললেন, ‘গোপালক বাবু আসতে পারলেন না। আমি তাঁর একটি শুভেচ্ছা বার্তা এনেছি। সভায় পড়ব।’ তাঁকে আমরা ঘিরে ধরলাম— ‘বলুন তো মশাই কে এই গোপালক?’ ভদ্রলোক মিটিমিটি হাসেন আর বলেন, ‘বলতে মানা আছে, তবে একজন বিখ্যাত লেখক।’ নারাণদা জিগ্যেস করেন, ‘শরদিন্দু? বিমল মিত্তির? নৃপেন চাট্টোজে?’ ভদ্রলোক শুধু হাসেন। নারাণদা তাঁকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন— বললেন আমাদের চুপি চুপি, ‘বুঝলে সুধীর, জেরার কৌশলে গল্প কায়দায় ঠিক জেনে নেব গোপালকের হদিশ। আমি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এটা পারব না?’ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের বুদ্ধি মত্তার তিনি অনেক গল্পো বলেছিলেন আমাদের— সে কথা এখন থাক। মোদ্দা কথা, নারাণদার ছিল শার্প ব্রেন এবং অসম্ভব জনসংযোগের কৌশল আর সেই সঙ্গে অমন সুন্দর চেহারা তার ওপরে তখন তো নারাণদার যৌবন পর্ব।

পরদিন সকালে ট্রেনে কলকাতা যাচ্ছি। নারাণদাও এলেন ভদ্রলোককে টেনে তুলে দিতে। বিরক্ত মুখে বললেন, ‘উঁহু, কিছু বার করতে পারলাম না পেট থেকে। কঠিন ব্যক্তি এই গোপালক।’ সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ‘রাওয়াল’ বেশ পাঠকপ্রিয়তা পেল এবং ‘হোমশিখা’ প্রকাশনী, থেকে বই আকারে বেরোল। অথচ লেখককে ধরা গেল না, কাজটা বেআইনিও বটে প্রকাশকের পক্ষে। গোপালকের বলা ছিল তাঁকে কোনো পত্রিকা পাঠানোর দরকার নেই এবং রয়্যালটি ইত্যাদি লেখক প্রাপ্য রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁর নামে পাঠানোর নির্দেশ ছিল। কর্তৃপক্ষ তাই করলেন। কিন্তু কী করে রটে গেল নারাণদাই গোপালক। কথাটা সত্যি। এ ব্যাপারে তাঁর কূটকৌশল আর দুষ্টবুদ্ধি ব্যাখ্যা করে নারাণদা একটা চমৎকার চিঠি লিখেছিলেন এবং আশ্চর্য যে সেই চিঠির হস্তাক্ষর মোটেই নারাণদার মতো নয় একেবারে গোপালকের মতো। হায়, অনেক ভাল জিনিসের সেই আশ্চর্য চিঠিটি আমি হারিয়ে ফেলেছি। তখন তো বুঝিনি আমার নারাণদা ভবিষ্যতে হয়ে উঠবেন এত বড় বিখ্যাত নভেলিস্ট। পরে, অনেক পরে ‘রাওয়াল’ নাম পালটে ‘নীলিমায় নীল’ নামে ছাপা হয়েছে এবং হ্যাঁ, তার লেখক অদ্বিতীয় নারায়ণ সান্যাল। প্রকাশক কলকাতার।

এ সব ঘটনার টুকরো জড়ো করে আশা করি নারায়ণ সান্যালের লেখক জীবনের প্রস্তুতি পর্ব তথা আমাদের কৃষ্ণগর পর্ব খানিকটা বোঝানো গেল। নারাণদার জীবন ছিল আনন্দে ও রসে টাইটসুর, যাকে বলে একটা জীবন্ত নভেল।

কাছ থেকে দূরে

চন্দন সান্যাল

বাংলা সাহিত্যে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অবাধে বিচরণই শুধু নয়, প্রতিটি বিষয়ের অতলান্ত গভীরতায় পাঠককে আকর্ষণ করার যে দুর্লভ প্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন নারায়ণ সান্যাল তার দ্বিতীয় কোন উদাহরণ আমার জানা নেই। পেশায় বাস্তবকার হওয়ার সুবাদে যদি তাঁর ‘লা জবাব দেহলী’... ‘কলিঙ্গের দেব দেউল’ ইত্যাদি রচনার ব্যাখ্যা খুঁজতে বসি, তাহলে তাঁর ‘না মানুষের বিশ্বকোষ’ রচনা দেখে ভাবতে হবে তিনি ছিলেন একজন জীব বিজ্ঞানী। আবার তাঁর রচিত ‘বিশ্বাসঘাতক’, ‘নক্ষত্র লোকের দেবতাত্মা’, ‘অবাক পৃথিবী’... ইত্যাদি পাঠে মনে হতে পারে তিনি ছিলেন পদার্থবিদ। একইভাবে ‘দন্ডকশবরী’ পাঠে মনে হবে তিনি নৃতত্ত্ববিদ ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারেন না। আসলে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু এতই বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে যে পাঠকের পক্ষে বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তিনি সে বিস্ময়ের জবাবে নিজেকে পল্লবগ্রাহী বলে আখ্যা দিয়েছেন। সাহিত্যের সুধারসে প্রতিটি বিষয়কে রসোত্তীর্ণ করে তোলার নৈপুণ্যে বাংলা সাহিত্যে তাঁর রচনাগুলি সার্থক ক্ষেত্র-সমীক্ষা মূলক উপন্যাসে উত্তীর্ণ।

৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫ সূর্যোদয়ের প্রাক মুহূর্তে কোলকাতায় নিজগৃহে সকলের অজান্তে সাহিত্যের আসর থেকে তিনি শেষ বিদায় নিয়েছেন। ৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বইমেলা থেকে ফেরার পথে তাঁর প্রথম হৃদরোগ আক্রান্ত হওয়ার বিবরণ ‘আবার সে এসেছে ফিরিয়া’ গ্রন্থে সবিশেষে তিনি লিখে গেছেন। সে বইতে বেকবাগান নার্সিংহোমের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট ফেরতা নারায়ণ সান্যাল সুকুমার রায়ের পাগলা দাশুকে অনুকরণ করে সাহিত্য জগতে আবার কলম ধরতে পারা নিয়ে বেশ একটো রঙ্গ রসিকতা করেছেন। তার কয়েক বছর পরে আমাদের জাতীয় রাজনীতি আসরের বিদূষক পাটলিপুত্রাধীশ যাদব কুলপতিকে সাহিত্যের বাণিজ্যিকরণ কেন্দ্র কোলকাতা বই মেলার উদ্বোধক হিসাবে দেখে তাঁর দ্বিতীয় দফার হৃদয় বিদারণ ঘটে। সে বারেও তিনি সামাল দিয়ে ফিরে এসে আরও একগুচ্ছ লেখার সম্ভার রেখে গেছেন সাহিত্যের মহাফেজ খানায়। কিন্তু অবশেষে তৃতীয় দফার ধাক্কায় তিনি আর কোন বদ্যিকে সুযোগ দেননি অন্ততঃ রূপমঞ্জরীর আগের পর্বটা শেষ করে যাওয়ার পরমায়ুটুকু পেতে। শেষবারের আক্রমণও বইমেলায় সময়। তবু প্রথমবার আর এই তিসরি ও শেষ কিস্তির হৃদয়দ্বারে আঘাত পাওয়ার মধ্যে ‘শ্যোর-ই-শহিদ’, ‘রাণী কাদম্বিনী’, ‘দান্তে ও বিয়াচিত্রে’, ‘হিন্দু না ওরা মুসলিম’ এবং ‘রূপমঞ্জরী’র দ্বিতীয় পর্বের মতো একাধারে জীবন-আশ্রয়ী ও ইতিহাস আশ্রয়ী গবেষণা মূলক সৃষ্টিগুলি সম্পদ হিসাবে পাওয়া গেছে। তাঁর একাশি বছরের আয়ুমান জীবনের পঞ্চাশোর্ধ্ব কাল ধরে যে শতাব্দিক বই আমাদের উপহার দিয়েছেন তার নানান স্বাদ নানান ব্যাঞ্জনা। সেগুলির মধ্যে যেমন গবেষণাধর্মী জীবন আলোচ্য, ইতিহাস আশ্রয়ী অনুসন্ধানী লিখন, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞান আশ্রয়ী মণিযুক্ত রয়েছে, তেমনই রয়েছে শিশু-কিশোর-সদ্যাসঙ্কর সাহিত্য, ভ্রমণ সাহিত্য, কল্পবিজ্ঞান, গোয়েন্দা গল্প ইত্যাদি বৈচিত্র্য। সে বিশাল পরিসরের সারস্বত বিশ্লেষণ করতে বসার

আমার পক্ষে যে হঠকারিতা সে কথা বুঝতে পারার মতো বুদ্ধি আমার শূন্যপ্রায় ঘটেও আছে।

একজন নির্ভেজাল পাঠকের রসাস্বাদন ভিন্ন আমার অন্য ভূমিকা তাই সভয়ে পরিত্যাগ করে সে দায়িত্ব বিদ্বজ্জনদের জন্যে রেখে দিই। বরং নারায়ণ সান্যালের ভ্রাতৃস্পুত্র হিসাবে শৈশব থেকে তাঁর স্নেহ ভালবাসা মিশ্রিত অভিভাবকত্বের যে স্পর্শ পেয়েছি তার স্মৃতিচারণ করলে আমার অধিকার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠবে না। আমাদের পরিবারকে আক্ষরিক অর্থে যৌথ পরিবার বলা না গেলেও নারায়ণ সান্যালেরই ভাষা অনুকরণে না বিযুক্ত পরিবার ছিল বলা যায়। যে পরিবারের বড়দা বলতে জ্যাঠাতুতো দাদা, সেজদা বলতেও জ্যাঠাতুতো দাদা, আর নিজের বড়দা পারিবারিক স্থানিক পর্বে হয়ে যায় ছোটদা। নিজের বড়দিদি সেই না বিযুক্ত পরিবারের মেজদি। সে পরিবারের সকলে একঠাই থেকে একই হাঁড়ির অন্নগ্রহণ করার আদর্শ একান্নবতী না হলেও পারিবারিক বন্ধনের সূত্রগুলি আজকের দিনের মতো লোপাট হয়ে যায়নি।

পারিবারিক নিয়মে তাই আমার একমাত্র কাকা হলেও নারায়ণ সান্যাল ছিলেন আমার— শুধু কাকা নয়, ছোটকাকু। অর্থাৎ লতায় পাতায় আমার বড়, মেজ, সেজ... ইত্যাদি আরও অনেক কাকা ছিলেন। তেমনি আবার সেই না বিযুক্ত পরিবারের সবচেয়ে ছোট ছেলে নারায়ণ ক্লাস নাইন থেকেই নিজের বড়দি (পারিবারিক মেজদি)র কাছে আসনসোলে থেকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। আবার তাঁদের পরের প্রজন্মে অর্থাৎ যে প্রজন্মের আমি প্রতিভূ, সেখানেও আমার মায়ের পেটের কোন দিদি না থাকলেও আমার পিসির মেয়ে হয়ে রয়েছে আমাদের বড়দি আর আমার নিজের জ্যাঠার মেয়ে মেজদি। সেই মেজদি তো তার স্কুলজীবন কৃষ্ণগর লালবাড়িতে থেকে গভঃ গার্লস স্কুলের ছাত্রী হিসাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে। তার স্কুল জীবনে দীর্ঘ ছুটির দিনগুলোতেই সে কেবল তার মা বাবার কাছে ডিহিরি অন শোজে যেতে পারতো। কিন্তু কৃষ্ণগরে তার বড়কাকু আর ছোটমা, মানে আমার বাবা আর মা সেই না বিযুক্ত পরিবারের ধর্মে তার বাবা মায়ের আসন নিয়েছিলেন। মেজদি তো চিরকালটা— সে থাকিবে সুখে/মার চেয়ে আপনার ছোটমার বুক— হয়েই থেকে গেছে।

ছোটকাকুকে নিয়ে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক বুঝতে গেলে স্মৃতির সরণী হয়ে অন্তত বছর ষাট পঁয়ষাট পিছিয়ে যেতে হবে মশাই। নাহলে অধুনা বিযুক্ত পারিবারিক সম্পর্কের যে উচ্চফলনশীল প্রযুক্তির নমুনা দেখছি তা দিয়ে সেই সময়টাকে ধরাই যাবে না। ছোটকাকুর একমাত্র ছেলে রাণার দুই ফুটফুটে ছেলে বা আমার সেই মেজদির আদরের নাতি নাতনি আর আমার নাতি নাতনি কেউ কাউকে চেনেই না। ভালমন্দ বিচারের কথা অবাস্তব। কিন্তু দুনিয়া বদলের অমোঘ নিয়মে এটাই বাস্তব।

পারিবারিক সম্পর্কের মুখবন্ধটুকু করলাম, তারই পটভূমিতে ক্যামেরাকে তাক করান এক বারো বছরের কিশোরের উপর। পরনে ইজের আর জামা, জৈষ্ঠ্যের খরতাপ রোদ্দুরে একা দুচাকার সাইকেলে চলেছে কৃষ্ণগর থেকে ফুলিয়া। সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ঝুলছে একটা এ্যালুমিনিয়ামের

জলভরা হাঁড়ি গামছা দিয়ে সম্পূর্ণ ঢাকা। তাতে বেশ কিছু জীবন্ত কই মাছ খলবল করছে।

ফুলিয়ায় উদাস্ত কল্যাণে গড়ে তোলা হচ্ছে আদর্শ নগর, ছোটকাকু তার বাস্তুকার ও রূপকার। বল্লম না, সে সময়ের সব হিসাব কিতাব আলাদা! কৃষ্ণগরের বাড়ি থেকে সরকারি তেল পুড়িয়ে যাওয়া আসার কথা তখন ভাবাই যেত না। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ফুলিয়ায় দু কামরার ছোট্ট কোয়ার্টারে থাকেন। তাঁর মাতাঠাকরুণ, মানে আমার ঠান্মা কৃষ্ণগরে বাড়িতে একগাদা জীবন্ত কই মাছ ভেট পেয়েছেন। আহা রে কোলের ছেলে নারাণ বড় কই মাছ ভালবাসে। অতএব ভালবাসায় ভালবাসায় ধুল পরিমান। এই বান্দা তার ছোটকাকুর কাছে কই মাছ পৌঁছে দিয়ে দিনের দিন ফিরে আসতে একপায়ে খাড়া। ছোটকাকুর কিছুক্ষণের সঙ্গ পাওয়ার নেশা, রাঙামার আদর আর ছোট্ট বুড়ুড়িকে কোলে তোলার বদলে ২৬-২৭ মাইল সাইকেলে যাতায়াত তো নরুণের বদলে নাক পাওয়া।

ছোটকাকু বদলী হলেন বর্ধমানের শক্তিগড় হয়ে বরশুল বলে এক অখ্যাত জায়গায়। রাজ্য ব্যাপী উদাস্ত কল্যাণের আরেক উপনগর গড়ে উঠছে সেখানে।

এই বান্দার ততদিনে কলিজিয়েট স্কুলের টেষ্ট পরীক্ষা শেষ। তিন মাস পরে স্কুল ফাইনাল। সে আমলে আইন করে প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার প্রস্তাব ছিলই না। স্কুলে পড়ানোর পরেও তাঁদের পয়সা নিয়ে প্রাইভেট কোচিং এর কথা বলার সাহস দুচার জন ব্যতিক্রমী ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে সুলভ ছিল না।

বাবাকে ছোটকাকু প্রস্তাব দিলেন আমাকে তাঁর কাছে দুমাসের কোচিং নিতে পাঠিয়ে দিতে। আমি তো বইপত্র নিয়ে টেস্টপেপার বগলে বরশুল পৌঁছালাম। ছোটকাকুর কলমের ডগা দিয়ে তখনও গবেষণা লব্ধ উৎপাদন বাজারে আসেনি। ‘বকুলতলা পি এল ক্যাম্প’ আর ‘গ্রাম্যবাস্তু’ তখন সবে প্রকাশনার আলো দেখেছে। তাঁর খনিগর্ভে তখন অজস্র সম্পদ বহির্গমনের পথ খুঁজছে। এতাদৃশ অবস্থায় তাঁর প্রকৃত ভাইপো-র প্রাকৃত অর্থো ভাইপো হওয়ার দাখিল।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রন, শেলী, কিটস থেকে কালিদাস, চন্ডিদাস, কৃষ্ণিবাস, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন জীবনানন্দ। ডিকেন্স, হুগো, স্কট, টলস্টয় মোঁপাসাঁ থেকে বঙ্কিম, শরৎ, তারশঙ্কর, বিভূতিভূষণ। আর্কিমিডিস, নিউটন থেকে আইনস্টাইন হয়ে সত্যেন বোস। মহেঞ্জোদরো থেকে মেসোপটেমিয়া, রোম থেকে ফ্যারাও, আর্যাবত থেকে দক্ষিণাত্য, পাঠান মোগল শক স্থল থেকে পাল সেন চোল চেদি গুর্জর কোথায় না টেনে নিয়ে গেছেন! ভাইপো-র এদিকে সেই বেড়াল ছানার অবস্থা— তিনি যত বলেন -চছজবাঞ/আমি তত বলি মিঞ! সে সময়টা কিন্তু ছিল বড় সুখের। ভোগ্যপণ্যের মাপকাঠিতে বড়বড় সুখ পাওয়া নয়, সে সুখের স্বাদই আলাদা, মাত্রা আলাদা। ফ্রিজ টিভি কুলার মোবাইল কম্পিউটার বাইক এসব কল্পনার অতীত।

সদ্য স্বাধীন দেশে ’৪৮ সালে চব্বিশ বছর বয়সে ছোটকাকু পি ডব্লু ডিতে চাকরী পেয়ে বালুরঘাট যাবেন। না বিযুক্ত পরিবারের সবার ছোটছেলে বিদেশে বিড়ুঁইয়ে থাকবে কোথায়, খাবে

কি? অতএব তাঁর মেজবৌদি অর্থাৎ আমার মায়ের, পড়ল দায়িত্ব গোছগাছ করে দিয়ে আসার। আমার বয়স আট আর আমার পরে তিন বছর অন্তর অন্তর দুভাই। পৌঁটলা পুঁটলী বেঁধে আমরা চক্লাম বালুরঘাট। দুকামরার ইঁটের দেওয়ালের উপর করগেটেড টিনের ছাদ, বারান্দাতেও তাই। ঘরের মেঝেতে সিমেন্ট হয়নি, কাঁচা মাটির। তাতে রোজ গোবর জলে নিকিয়ে নিতে হয়। বিজলী বাতি নেই, আসবাব বলতে কেরোসিন কাঠের তন্তুপোষ আর মাদুর। বারান্দা থেকে নেমে বেশ প্রশস্ত উঠোন যার একদিকে মস্ত কুলের গাছ। এটাই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কুঠি। স্কুলের পড়া? হা ঈশ্বর! তখন কি আর এখনকার মতো নার্সিংহোম ফেরৎ কিন্ডার গার্ডেনে বীজ পুঁতে জল ঢালার রেওয়াজ ছিল! বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ, প্যারিচাঁদের বিএলএ-ব্লু, সিএলএ-ব্লু আর এ স্লাই ফক্স মেট এ হেন পর্যন্ত বিদ্যা বাড়ি বসেই আয়ত্ত্ব করতে হতো। নামতা শতকিয়া থেকে যাদব চক্রবর্তীর প্রথম দশটি অনুশীলন করতে বাড়ির কাকা মামা দাদা এরাই যথেষ্ট ছিল। আমার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পেয়ে গিয়েছিলাম মায়ের কাছ থেকে। ছোটকাকুর চেয়ে একবছর এবং বিয়েরও একবছর আগে তিনি প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিলেন। সে আমলের ম্যাট্রিক পাশ যে এ আমলের বি এ পাশের কান কেটে নিতে পারে তা আমার মাকে দিয়ে বুঝেছি।

বালুরঘাটে তাই বড় সুখের দিন ছিল। বাঁধাধরা স্কুলে যাওয়া নেই। ছোটকাকুর কাছে খেলার ছলে পড়া আর পড়তে পড়তে খেলা। কত যে বুদ্ধির খেলা, মানসাক্ষ, বাঁধা প্রশ্নোত্তর মাথা থেকে বের করতেন ছোটকাকু তার ইয়ত্তা ছিলনা। পঞ্চম বছর পরেও সে সঞ্চয় ভেঙ্গে খেয়ে চলেছি বহু আসরে। বিজলীবাতিহীন লঠনের আলোতে পাটি পেতে মেঝেতে বসে ছোটকাকুর মুখে বিদেশী কালজরী উপন্যাস শোনার স্মৃতি তাঁর সকল উপন্যাস নিজে নিজে পড়ার চেয়ে অনেক জীবন্ত ছিল বলে আজও আমার মনে হয়। কবিতা গান ছড়া ছবি শ্লোক স্তোত্র এসবের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে তাঁর অক্লান্ত প্রয়াসের মূল্য আজ বুঝতে পারি।

তখনও তিনি সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল হয়ে ওঠেননি। তাঁর ভবিষ্যত সম্ভাবনার অঙ্কুর বলে দেয় যে একদিন তিনি মহীরূহ হয়ে উঠবেন। কিন্তু সেদিন তিনি ছিলেন আমার নাগালের মধ্যে। কচি একটা ডাল হাত দিয়ে নামিয়ে এনে কোড়কের যে আশ্রান পেতাম তা একান্তই আমার ছিল। কত আসরে তাঁর লেখা কবিতা বলে, তাঁরই রচিত কবিগান গেয়ে হাততালি কুড়িয়েছি সেই শৈশবে। কিন্তু তিনি যতই বড় হয়েছেন, ততই আমার নাগালের বাইরে চলে গেছেন। নেতাজী জন্মোৎসবে এক বড় কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, যার শেষ পংক্তি ছিল—

হেই নেতাজী, দেবতা তুমি মস্ত্র অনেক জানো,

একটি মস্ত্র বলে তবে সেদিনটারে আনো—

তোমার স্বপন করব সফল তোমার আশিস পেলে।

আমিও তো তোমার মত বাংলা মায়ের ছেলে।

এমন বহু কবিতা একান্তভাবে আমার জন্যেই লেখা হয়েছিল। আজ তাঁর বিশাল সাহিত্যের ভাণ্ডার সার্বজনীন। সেখানে আমি অন্য দশজনের মাঝে হারিয়ে গিয়েছি কিনা বুঝে পাইনা। কাছ থেকে দূরে

যাওয়ার অভিমান যেমন আমার কাছে গর্বের তেমনই এক কিশোর সুলভ বেদনারও বটে।

আমার সঙ্গে ছোটকাকুর সম্পর্কের হিসাব যেমন সরল, মনে হয় কৃষ্ণগরবাসীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ততটাই জটিল। তিনি নিজেকে একাধিক লেখায় কৃষ্ণকলি বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কৃষ্ণগর আর কোলকাতা এ দুয়ের সংমিশ্রণে তিনি পূর্ণতা পেয়েছেন। তিনি বলেছেন— জন্মসূত্রে তিনি কৃষ্ণাগরিক এবং কর্মসূত্রে কোলকাতাবাসী। কিন্তু বাস্তবে তাঁর জন্ম কোলকাতার কালিঘাটের ভাড়া বাড়িতে। স্কুলের পড়া কোলকাতার সিটি স্কুল হিন্দু স্কুল আর আসানসোলার ই. আই. আর স্কুলে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই এসসি পাশ করে কোলকাতায় জাপানী বোমার ভয়ে আমার ঠাকুর্দা সপরিবারে কৃষ্ণগরে লালবাড়িতে চলে এলে ছোটকাকু দুবছরের জন্য কৃষ্ণগর গভঃ কলেজে বিএসসি পড়েন। তারপর বি. ই. কলেজের পাঠ শেষে '৪৮ সাল থেকে চাকরির সুবাদে বালুরঘাট মেদিনীপুর হয়ে '৫২ সালে বছর দুয়েকের জন্যে নদীয়ায় বদলি হন। এর মধ্যে অবশ্য '৫০ সালে বিবাহ অনুষ্ঠান হয়েছে কৃষ্ণগরের পৈত্রিক বাড়িতে। ঠাকুর্দা তার বছর চারেক আগে কাশীধামে দেহ রেখেছিলেন। ঐ দুবছর চাকরির কারণে কৃষ্ণগরে থাকা কালে কৃষ্ণগর থেকে প্রকাশিত ও শিশু সাহিত্যিক ননীগোপাল চক্রবর্তী সম্পাদিত হোমশিক্ষা সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে তিনি বিপুল উৎসাহে জড়িয়ে ছিলেন। সেখান থেকেই তাঁর সাহিত্যের খনিমুখ উন্মোচিত হতে থাকে। তাঁর স্মৃতিকথায় ননী জ্যাঠার মাধ্যমে মনোজ বসুর উৎসাহে প্রথম সাড়া জাগান উপন্যাস 'বকুলতলা পি এল ক্যাম্প' প্রকাশের উল্লেখ পাই কৃষ্ণগর থেকে বদলী হয়ে যাওয়ার একবছর পর '৫৫ সালে। তারপর তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে দণ্ডকশবরী ও নৈমিষারণ্য প্রকাশিত হলে সাহিত্যে তাঁর নিজস্ব বিশিষ্ট ধারাটি স্থান করে নেয়।

শুনছি নাকি বন্দি বুড়ো হাত দিয়ে ভাত মাখে...। বন্দিবুড়োকে লুঙ্গি পড়ে গেঞ্জি গায়ে পাড়ার মোড়ে সিগ্রেট কিনতে অথবা বাজারের থলি হাতে পাত্রবাজার থেকে মাছ কিনতে দেখলে যে রোমাঞ্চ পাওয়া যায় তা কৃষ্ণগরবাসী কোনদিন পায়নি। এমনকি বিশাল মাপের সাহিত্যিকের সঙ্গে এলেবেলে মজলিশি আড্ডার সুযোগ কৃষ্ণগরের কোন উঠতি স্বপ্নালু চোখের কবি সাহিত্যিকেরা যে পায়নি এটা তাদের দুর্ভাগ্য। সেলুলয়েডের পর্দায় নায়ক যখন পাশের বাড়িতে বসে তেলে ভাজা আর মুড়ি গান, তখন পাড়ার লোকের তা দেখতে এবং দেখানতে যে গর্ব মিশ্রিত আনন্দ ফুটে ওঠে তেমনটা পরিণত নারায়ণ সান্যালের ক্ষেত্রে কৃষ্ণাগরিকদের ঘটেনি। তার না বিযুক্ত পরিবারের একাংশের জন্ম কর্ম এবং লয় কৃষ্ণগরেই ঘটেছে বটে, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে কোনটাই ঘটেনি। এমন কি তাঁর পিতা আমার ঠাকুর্দা চিন্তসুখ সান্যাল অসামান্য স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন মূলক যে লালবাড়ি বানিয়েছিলেন আজ থেকে একশতাধিক বছর আগে, সেখানে তিনি নিজে সাকুল্যে কতদিন বসবাস করেছেন তা হাতে গোনা যায়। আমার ঠাকুমা মারা গেলে কৃষ্ণগরের সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি ছোটকাকু পান। তার মধ্যে ছিল গোটা চারেক বাড়ি আর খালি জমি। তিনি একে একে সেসব পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করেছেন '৭৩ সালের মধ্যে। অন্য তিনটি বাড়ি তৎকালীন ভাড়াটিয়া বা বাইরের খরিদারের কাছে বিক্রি করলেও খালি জমিটি আমাদের না-

বিযুক্ত পরিবারের তাঁর বড়বোনের দুই ছেলে মেয়ে এবং সেজবোন তাঁর মেয়ের তাঁর মেয়ের জন্যে কিনে নেন। এবং সর্বশেষ কৃষ্ণগরের লালবাড়িটি তাঁর কাছ থেকে আমার মা, অর্থাৎ তাঁর মেজবৌদি কিনে নেওয়ায় সেটা না বিযুক্ত সান্যাল পরিবারে রয়ে গেছে। কোলকাতায় চক্রবেড়িয়াতে '৬৬ সালেই তাঁর নতুন বাড়ি নির্মানের পর থেকে কার্যত কৃষ্ণগরের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ ক্ষীণ হতে থাকে। পারিবারিক অনুষ্ঠান অথবা কোন সংস্থার বিশেষ আমন্ত্রণ ছাড়া তাঁর যে আর কৃষ্ণগরে আসার সময় সঙ্কুলনে সম্ভব ছিল না সেকথা বুঝি। কিন্তু মানসিক ভাবে তাঁর কৃষ্ণগরের প্রতি টান শেষদিন পর্যন্ত ছিল অক্ষুণ্ণ। নিজেকে তিনি কৃষ্ণকলি আখ্যা দিয়ে কৃষ্ণগরের প্রতি যে সম্মান জানিয়েছেন, আমাদের নিশ্চয়ই তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে। সেদিক থেকে 'পরিধি' পরিচালকবর্গের প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কৃষ্ণগরের বিশেষ স্থান সেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকেই লোকপরম্পরায় রয়ে গেছে। তার উপর আমাদের না বিযুক্ত সান্যাল পরিবারের বংশলতিকা দারণ ইন্টারেস্টিং। নারায়ণ সান্যালের ঠাকুরদা, রজনীকান্ত সান্যালের বিবাহ হয় কালিচরণ লাহিড়ীর কন্যা রাজকিশোরী দেবীর সঙ্গে। আবার কালিচরণ লাহিড়ীর অগ্রজ ছিলেন প্রখ্যাত রামতনু লাহিড়ী। এদিকে কালিচরণ লাহিড়ীর দাদামশাই রাধাকান্ত রায়ের পৌত্র ছিলেন দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, যাঁর পুত্র ছিলেন কৃষ্ণগরের গর্ব দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। অর্থাৎ আমাদের না বিযুক্ত সান্যাল পরিবারের মাতুল বংশে ছিলেন রামতনু লাহিড়ী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দিলীপ রায় প্রমুখ স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

অন্যদিকে নারায়ণ সান্যালের পিতা, আমার ঠাকুরদা, চিত্তসুখ সান্যাল ছিলেন একাধারে ব্রিটিশ আমলে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাশ করা একজন কৃতি বাস্তবকার এবং বিভিন্ন বিদ্যা বিশারদ অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। বাড়িতে শুনেছি যে তিনি আমার সম্পর্কিত পিসিকে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে সংস্কৃত পড়াতেন। তিনি নিজেও ছিলেন একজন সুলেখক এবং তৎকালে প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র পত্রিকার সম্পাদক। বংশ তালিকা প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় যে নারায়ণ সান্যালের ঠাকুরদা, রাজকিশোরী দেবীর বোন রত্নবলী দেবীর পুত্র ছিলেন কৃষ্ণগরের আর এক প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব— অমিয় নাথ সান্যাল। মার্গ সঙ্গীতের আসরে তাঁর খ্যাতি ছিল ভারত জুড়ে। আবার তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের উপর দখল ছিল অসাধারণ। তাঁর অনন্য সাধারণ জীবনের কিয়দংশ তাঁর লেখা 'স্মৃতির অতলে' গ্রন্থে পাওয়া যায়। আর তাঁর স্নেহস্পর্শ যেমন আমি পেয়েছি তেমনই তাঁর সরস পাণ্ডিত্যপূর্ণ সান্ধ্য মজলিশের স্বাদ পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন এখনও কৃষ্ণগরে বর্তমান।

এমন এক বংশ লতিকার শরিক এবং এক সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে গণ্য, কৃষ্ণগর শহরে যাঁর উৎসমুখ, তিনি যে হেলিক্সকোডের রূপোর মই এ চড়েই যে জন্মাবেন সে কথা মানুষজন যতই বলাবলি করেন, আমার ততই কেন জানি না মনে হয় জেনেটিক কোডের অঙ্ক

নিয়ে আরও গবেষণার জন্য একজন আইনস্টাইনের প্রয়োজন। কোন একটা আপেক্ষিকের ধাঁধা না থাকলে একই ক্ষেত্রে একই বংশলতিকা বুকে নিয়ে আমার মতো অলাবুই বা ফলে কি করে সেই একই লতায়! আর সবাইকে ছেড়ে অষ্টম গর্ভের সন্তানটিই বা বোস বংশে ভারতগর্ব নেতাজী হন কি করে! আসলে সাফল্যের অঙ্ক যে সরল পাটিগণিত নয় সেকথা এতদিনে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

একনজরে তাঁর পাওয়া পুরস্কারগুলো দেখলে আর এক ধাঁধার জন্ম হয়। রবীন্দ্র পুরস্কার, নরসিংহদাস পুরস্কার, বনফুল পুরস্কার, বিভূতিভূষণ স্মারক পুরস্কার, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মারক পুরস্কার— তালিকা দেখে বলাই যেতে পারে যে সাহিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে বহু স্মরণীয় পুরস্কারই তিনি পাননি। না পাওয়ার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দেওয়া গেলেও তাঁর সাহিত্যিকৃতি বৃদ্ধির সঙ্গে আনুপাতিক হারে তাঁর উপর থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পাদপ্রদীপের আলো সরে যাওয়া থেকেই সে ধাঁধার সৃষ্টি। এ বিষয়ে তিনি নিজে যে সচেতন এবং সম্ভবত স্পর্শকাতর ছিলেন তা তাঁর জবানবন্দী থেকে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন বাঙলা সাহিত্যে পোলারাইজেশন আরও তীব্র। পোলারাইজেশনের যে অর্থ আমরা ডান বা বাম পোল অবলম্বন করা থেকে বুঝি, মনে হয় তিনি তা থেকে মুক্ত থেকে শিল্পী সাহিত্যিকের এক নিজস্ব স্বাধীন সত্ত্বার স্বপক্ষে সওয়াল করতে করতে ক্রমশ একাকী হতে থাকেন। শুধু পুরস্কারের আধারেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও অবহেলার আঁধার তাঁকে পীড়া দেয়। তিনি নিজে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপক, কিন্তু বছর বছর সে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না পাওয়ার অভিমানের কথা তাঁর লেখা থেকে পাই। কোলকাতা শহরে মহা সাড়ম্বরে একটি পত্রিকা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ব্যাল্কোয়েট হল’এ যে পুরস্কার দেওয়া হয় তার প্রচার মূল্য বিশাল। তিনি সে পুরস্কার না পান, কয়েকশ’ আমন্ত্রিত কবি সাহিত্যিকের মধ্যেও তাঁর নাম না থাকায় পোলারাইজেশনের আরেক নমুনা পাওয়া যায় না কি? প্রথম আমন্ত্রণটি পাঠান হয় রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রক থেকে আর দ্বিতীয়টি সবচেয়ে নামী অসরকারী সাহিত্য গোষ্ঠী থেকে। তিনি তাই সংক্ষেপে বলেছেন, আমাকে কি শাস্ত নয় বৈষম্য দলে নাম লেখাতে হবে? কবীর পছন্দ হতে পারব না?

পশ্চিম মবঙ্গের রাজনৈতিক সুপার হিরোকে প্রতিবাদ করে তাঁর প্রকাশনা ‘এমনটাতে হয়েই থাকে’ পড়ে যাঁরা ভাবছিলেন এ তাহলে আমাদের আখড়ায় মাথা মুড়াবে, তাঁরাও যখন হতাশ হন তখন তাঁর মুখ থেকে স্পটলাইট সরিয়ে নেন সকলেই। তিনি যখন বলেন— মাঠের খেলোয়াড় যতবড় হিরোই হোক না কেন, ফাউল করলে তার নাকের সামনে লালকার্ড ধরার ক্ষমতা রাখতে হবে রেফারিকে। তিনি যখন লেখেন আপনাদের মিছিল দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, অর্থাৎ কায়মীস্বার্থপন্থী হলে চলবে না। আপনাদের হাতে তখনই হাত মেলাব যখন আপনারা হবেন সত্য-শিব-সুন্দরপন্থী, তখন তাঁকে মেনে নিতেই হবে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নৈরাজ্য একঘরে বিকর্ণের জীবন। যে জীবন বিদায় বেলাতেও সরকারি বা অসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য বাসরের স্বীকৃতি পায়নি। দুতিন কলম সেন্টিমিটারে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছাপা অথবা মিডিয়ার সংবাদ পরিবেশনে তাঁর মঞ্চ থেকে প্রস্থানের উল্লেখ, ব্যাস। এ বিষয়ে, তাঁর আকছার কথা তাঁর লেখা কবিতার শেষাংশ লক্ষ্য করা যেতে পারে—

রবে না কাহারও মনে— এই শিখা দিত
কত আলো। আনুগত্য-তথ্য যদি ফাইলে না মিলে
প্রমাণ হবে না— তুমি কোনদিন ছিলে
এই দুনিয়ায়!
হায়!
ভয় হয় তাই
আপন অস্তিত্বখানি কখন হারাই!
অনাগত যুগে কোন গবেষক এসে
ফুটনোট কন্টকিত থিসিসের শেষে
কহিবে কর্কশ কণ্ঠে : শোন! সবে শোন!
নারায়ণ সান্যাল নামে দুনিয়ায় কেউ কভু ছিল না কখনও!

সাহিত্য বেঁচে থাকে পাঠকের হৃদয়ে। তাঁর আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় অস্টা চলে গেলেও তাঁর সৃষ্টি অমরত্ব পাবে কারও প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে নয়, স্বকীয় শিল্প মহিমায়। এমন লাখো পাঠক আছেন যারা তাঁর অবয়ব কোনদিন দেখেনি, তাঁর নিবাস কোথায় বা ব্যক্তি পরিচয় কি তা জানে না, কিন্তু তাদের হৃদয়ে তাঁর কালজয়ী রচনাগুলি পুরুষানুক্রমে ভালবাসার, শ্রদ্ধার আসন পাবে।

চন্দন সান্যাল : নারায়ণ সান্যালের ভ্রাতৃপুত্র। কৃষ্ণাগারিক। গ্রামগ্রামান্তর পত্রিকার সম্পাদক
ও একটি সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের সচিব।

আলোচনাতে উপেক্ষিত হয়েও বেস্ট সেলর

আজিজুল হক

যে-কোন কুইজ মাস্টার তাঁর প্রতিযোগীদের জন্য প্রশ্ন রাখতে পারেন, ‘এমন একজন বাঙালি ঔপন্যাসিকের নাম করো যিনি কোনো কাগজ বা প্রচার মাধ্যমের সাহায্য না-পেয়েও জীবদ্দশাতেই সর্বাধিক পাঠক পেয়েছেন? কিম্বা যার লেখা প্রধানমন্ত্রীর টেবিল থেকে গৃহবধুর বালিশের ওপর দেখা যায়। নিঃসন্দেহে তিনি নারায়ণ সান্যাল। ‘রূপমঞ্জরী’, ‘লা-জবাব দেহলী’ ‘অপরূপা অজন্তা’ ‘চীন-ভারত লং মার্চ’-এর লেখক। লিখেছেন তিনি প্রায় দেড়শ বই। বলেছেন আরও বেশি, ব্যস্ত থেকেছেন অন্যান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে।

নিঃসন্দেহে ভ্রমণ-সাহিত্য তাঁর লেখাতে যে-মাত্রা পেয়েছে সেটা অনবদ্য। তাঁর আগে ভ্রমণ-কাহিনি মানে ছিল প্যাচ-প্যাচে প্রেমকথা। অজন্তা বা দিল্লী দেখতে গিয়ে সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে আলপ, তার দেহের ভূগোল... এবং ইত্যাদি।

নারায়ণবাবুই প্রথম ভ্রমণের সঙ্গে মেলালেন স্থাপত্য, পুরাণ এবং ইতিহাস। এ-কাজ আর কারোর পক্ষে করা সম্ভব কিনা জানি না, অন্ততঃপক্ষে এখনও কেউ নেই। বিশ্বসাহিত্যে কেনেথ ক্লার্ক-এর ‘সিভিলাইজেশন’-এর সঙ্গে তুলনীয়। অথচ তিনি আলোচ্য নন পণ্ডিতমহলে, কারণ— ‘কথার গুণে তরি/কথার দোষেই মরি...’ তাঁর অনবদ্য কথন ভঙ্গির জন্যই তিনি আদরণীয়, আবার এরই জন্য তিনি পণ্ডিতমহলে ব্রাত্য।

কেপ্টনগরের বিখ্যাত সান্যাল পরিবারের সন্তান, পেশায় বাস্তববিদ বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, কর্মসূত্রে দায়িত্বে ছিলেন এমন সমস্ত জায়গায় যেখানে কেউ যেতে চাইতেন না। কিম্বা ‘সোনার খনি’ প্রতিষ্ঠার সময়ে ছিলেন দণ্ডকারণ্যে। পুনর্বাসনের টাকার নয়-ছয় দেখে বিচলিত হয়ে লিখে ফেলেন, ‘সত্যকাম’। আবার যখন রোজেনবুর্গ-কে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে বিচারের নামে হত্যা করা হয়, তুলে ধরেন ‘দেশপ্রেম’ আর মানব-প্রেমের ফারাক, প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, ‘কে বিশ্বাসঘাতক?...’ লক্ষ-লক্ষ মানুষকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রকারীরা, না, সেই ষড়যন্ত্র যে-বানচাল করছে সে? এই হচ্ছেন নারায়ণ সান্যাল।

কলকাতাতে ছেলেগুলো মরছে, ছটফট করছেন শিল্পী। খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেন ওরা মরছে? নিজের প্রাণাধিক ভাইপো। প্রেসিডেন্সী থেকে বিতাড়িত, অমল, জিজ্ঞাসা করেন তাকে, মানতে পারেন না, ফেলতেও পারেন না... বিদ্যাসাগরের মূর্তির মাথা কী করে এরা ভাঙতে পারে, যারা কৃষকদের জন্য নিবেদিত প্রাণ, সর্বস্ব-তাগী মহান বিপ্লবী, তারা বিদ্যাসাগরকে হেনস্থা করবে কেন? মাথায় এক গাদা প্রশ্ন নিয়ে গেলেন বার্লিনে, ভারত মেলা। তাঁর কথাতে : মেলাতে ঘুরতে ঘুরতে কী যেন একটা দেখছি, এক তরুণী জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কি কলকাতাতে থাকো?’

বললাম, ‘হ্যাঁ, নকশাল চারু মজুমদার এঁদের সম্পর্কে কিছু জানো?...’

‘অবাক হলাম।’

তাঁর অবাক হবার ফলে বাঙালি পাঠক পেলেন, ‘চীন-ভারত লং মার্চ’, বোকা বুড়োটা (চারু

মজুমদার) পাথর কেটেই চলেছে...। অন্য মজুমদারের মত সিনেমার জন্য গল্প নয়। অবশ্য দ্বিতীয় সংস্করণে কেন যে বুড়োটাকে রাখলেন না। জিজ্ঞাসা করেছি, প্রকাশক ভ্যানতারার করে এটা করেছে। কথা ছিল প্রথম সংস্করণের লেখাটাই ফিরিয়ে আনবেন। আর হল না।

ভাগ্নে সুবাস মৈত্রের কল্যাণে ‘চেনা’-টা ‘জানা’ হয়ে যায়। উনি ছিলেন ‘ট্রটস্কি পন্থী’। আমি ঘোরতর ‘স্টালিনবাদী’। অদ্ভুতভাবে দু’জনে মিলে যেতাম মানুষের প্রশ্নে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আমি ছুটছি, ত্রাণ জোগাড় করে দিচ্ছেন উনি। একটা অসাধারণ নকশা করেছিলেন, বন্যাতে আশ্রয়। কয়েক বিঘা জমির ওপর ফ্ল্যাট সিঁড়ির ওপর (গরু, যাতে উঠতে পারে) থাম দিয়ে তৈরি প্ল্যাটফর্ম, তার সঙ্গে মানুষের আবাস, সম্ভাব্য গ্রামের মানুষের বাসস্থানের নকশা... কত স্বপ্ন ছিল তাঁর। দুজনে বসে স্বপ্ন দেখতাম, গ্রামবাংলাকে নিয়ে... উনি বলতেন, ‘যেমন করেই হোক হক-কে বাঁচাতে হবে।’ আমি বলতাম, দাদা এখনও আমাদের অনেক কাজ বাকি। বাঁচতে হবে আপনাকে। হক গেলে হক হবে। নারায়ণ সান্যাল কিন্তু জন্মায়, হয় না...

আমরা ছাত্র, ছাত্র ভান করতাম, আমি গুঁর কাছ থেকে জানতাম বেশি, জানতাম অজস্র গঠনপ্রণালী, তাজমহলের তৈরি রহস্য। উনি জানতে চাইতে পারসি শব্দের বাংলা, মুসলমান সমাজের ইতিবৃত্ত।

একটা বই লিখলেন, ‘হিন্দু মুসলমান’, কৃতজ্ঞ করে গেলেন আমাকে, বইটা উৎসর্গ করলেন আমাকে, ‘ভাই, আজিজুল, তুমি হিন্দু-পুরাণের গল্প জানো কি? আমাদের এক মুনি ছিলেন, সুর নিন্দিত, অ-সুর নির্যাতিত, তাই না-স্বর্গে, না-মর্তে কোথাও তাঁর জায়গা হল না। নাম অষ্টাবক্র’। গালাগালি অনেক শুনেছি, আজও শুনেই চলেছি, প্রশংসাও শুনি কিন্তু এই যে বিশেষণ অষ্টাবক্র এটাই অনবদ্য।

আন্দামান ঘুরে এসেই ফোন করলেন, ‘বলতে পারো, ভারতের একমাত্র বড়লাট বিপ্লবীদের হাতে খতম হয়েছিল কে সে?’

বললাম, ‘মেয়ো...’

‘ঠিক, ঠিক বলেছ। কে খতম করেছিলো জানো?’

‘শের আলি!’

‘ঠিক, অনেকেই জানে না।’

‘কেউই জানে না...’ আমি বললাম।

আমরা পেলাম, তার অনবদ্য লেখা ‘শের-ই দ্বীপ...’ আন্দামান ফেরত অনেকের লেখাই তো আছে। নারায়ণ বাবুই পারেন ‘শের আলি’-কে বাঁচিয়ে তুলতে, বেঁচে থাকবেন তিনি এঁদের মধ্যেই।

‘চির রোমান্টিক— নারায়ণ সান্যাল’

চন্ডী লাহিড়ী

নারায়ণ সান্যাল আমার চেয়ে বয়সে যথেষ্ট বড় হলেও সস্বোধন করতেন ‘চন্ডীদা’ বলে। মনে হয়, তাঁর ভাগীনেয় সুবাস আমায় চন্ডীদা বলে বলেই তিনিও সেই পথ অবলম্বন করেছিলেন সম্পর্কটা সহজ ও আন্তরিক রাখার জন্য। আমি বোধহয় শ্রদ্ধার আধিক্যবশতঃ তাঁকে যেমন নারায়ণদা বলিনি। নারায়ণবাবু বলে ডেকে দূরত্ব বাড়াতো চাইনি। একেবারে সামনে বসে, কেমন আছেন? এরকম একটা নৈর্ব্যক্তিক সস্বোধনে সবকিছু ম্যানেজ করতাম। আসলে নারায়ণবাবু আমার চোখে এতই বড় মাপের মানুষ যে কোন সম্পর্ক দিয়েই তাঁকে বাঁধা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যাঁরা তাঁর চারপাশের পরিচয় পায়নি, কেবল সাহিত্যিক হিসেবে দেখে বিচার করতে বসেছে আমি তো সে দলে নই। তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছি এবং তাঁকে সম্যক বোঝার জন্য যে মানসিক আধার দরকার সে আধার আমার মধ্যে ছিল। আমি দীর্ঘ কর্মজীবনে বহু সাহিত্যিক সাংবাদিককে দেখেছি। সবাইকেই (বন্ধুরা যেন রাগ করবেন না) মনে হয়েছে এক বগুণা। রাজনৈতিক দুঃসময়ে অনেকেই নীরব থাকেন। বিবৃতি দিলে পাটিওয়ালারা হয়তো চটবে। অতএব নীরব থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় হলে ভাষার মারপ্যাচে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই অনেক সাহিত্যিক বন্ধু শ্রেয় মনে করেন। নারায়ণ সান্যালের বিজ্ঞানমনস্কতা আশ্চর্যরকম সতেজ। পাশ কাটানো দূরের কথা, কয়েক হাজার টাকা খরচ করে বই কিনে ফেলতেন। যা বুঝতেন না অভিভূতদের কাছে বুঝে নিয়ে লিখতে বসতেন। আর্ট তাঁর বিষয়বস্তু নয়। অথচ যা করেছেন চিত্রসমালোচকরাও পারেনি।

এক অবচীচীন চিত্রসমালোচক ‘দেশ’ পত্রিকায় মন্তব্য করেছিলেন নারায়ণ সান্যাল তাঁর বইয়ে কাঁচা হাতে ছবি আঁকেন কেন। তাঁর বয়স তখন কম বলেই নারায়ণবাবু অভিমানে ক্ষুব্ধ হন। তার পাণ্টা জবাব নারায়ণবাবু লেখেন, কিন্তু দেশ সাপ্তাহিকে সেটা ছাপা হয়নি। বন্ধুবর সুরঞ্জিত ঘোষ নারায়ণবাবুর প্রতিবাদ পত্র (যেখানে আমার একটু সংযোজন ছিল) তাঁর প্রমা পত্রিকায় ছাপিয়ে অগ্রজ সাহিত্যিকের সম্মান রক্ষা করেন। ত্রিশ বছর আগের ঘটনা; সেই অকালপঙ্ক বেহালা নিবাসী চিত্রসমালোচক হারিয়ে গেছেন (বেঁচে আছেন কিন্তু এখন তিনি অচল আধুলি) কিন্তু নারায়ণ বাবু সেই ঘটনার পরেও অন্তত ত্রিশটা বই লিখেছেন এবং পাঠক মনে শ্রদ্ধার আসনে এখনও প্রতিষ্ঠিত আছেন।

নারায়ণবাবু আজন্ম রোমান্টিক মানুষ। তাঁর বন্ধুরা, যাঁরা দীর্ঘদিন নারায়ণবাবুকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাঁদের বর্ণনা শুনে মনে হয়েছে এই রোমান্টিসিজম জন্মসূত্রে পাওয়া। একই বিষয় নিয়ে দুবার বই লেখেননি। নিত্য বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করেছেন। নতুন বিষয় হাতের কাছে এলে সেটা দূরে সরিয়ে রাখেননি বরং তার গভীরে প্রবেশ করেছেন। কাগজ ভাঁজ করে জাপানীরা অরিগামী করে। প্রদর্শনীতে নমুনা দেখেছেন। তৎক্ষণাৎ বই কিনে হাতে-কাগজে সৃষ্টি করতে নেমেছেন। এটা রোমান্টিকের চরিত্র লক্ষণ। আবার ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হওয়া একটি অচেনা মেয়েকে আর কোনদিন রঙ্গমঞ্চে কেন দেখা গেলা না সেটা জানতে বুড়ো বয়সে ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশ

যাওয়াও তো রোমান্টিক মনের পরিচয়। নিজেকে বহুভাবে মেলে ধরার ঐকান্তিক ইচ্ছার অপর পিঠে নিজের ক্ষমতাকে নিজে যাচাই করে নেওয়ার বাসনাও থাকে। এ এক বিচিত্র প্রেমের খেলা নিজের সঙ্গে নিজের। আমাদের সবার মধ্যেই সেই দুটি পারসোনালিটি একই আধারে আছে। আমরা সবাই নিজের মধ্যেই আর এক আমিকে আবিষ্কার করে আনন্দ পাই। শিবপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রাবস্থায় প্রচুর থিয়েটার করেছেন। সেখানেই বাদল সরকারের সঙ্গে পরিচয়। সেই যে অভিনয় দক্ষতা সেটা কাজের চাপে মরচে পড়ে ভেঁতা হয়ে গিয়েছিল। পরিণত বয়সে আবার ইচ্ছা হল অভিনয় করবেন। টিভিতে উরু-কাতু-মদনা আরম্ভ করলেন। লোকে যত প্রশংসা করল, তার চেয়ে বেশি মুখ টিপে হাসল। নারায়ণবাবু থামেননি। এটাই রোমান্টিকের লক্ষণ। নারায়ণবাবুর নানা বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমার পরিচয় কমবেশি ত্রিশ বছরের। তাঁর অনেক বই আমি পড়িনি। আমার স্ত্রী বন্যা সেসব পড়েছে। আমি অকপটে নিজেকে বলি, ক্যাজুয়াল পাঠক। আমার কিছু পেশাগত বাধ্যবাধকতা আছে। কার্টুন আঁকার জন্য প্রচুর সময় আমাকে একলা থাকতে হয়। খবু সুন্দরী মহিলার নিবিড় সান্নিধ্যও আইডিয়া আনতে বা তাকে রূপ দিতে সাহায্য করে না। অন্য লেখকের বইয়ের গভীরে ডুব দিতে হলে নিজের সেই একাকীত্ব থেকে খানিকটা ব্যয় করতে হয়। একজন লেখক যে অন্য লেখকের বই পড়েন না তার প্রধান কারণ নিজেকে একান্তভাবে পাওয়ার যে দুর্লভ সময়, সেই সময় খরচ করে ফেলা। নারায়ণবাবুর বই হাতে পেয়েও যে অনেক সময় পড়ে উঠতে পারিনি তার কারণ এটাই। লেখক ও শিল্পী উভয়েরই লিখতে বা আঁকতে সময় বেশি লাগে না। কিন্তু কি লিখবেন এবং কিভাবে আঁকবেন সেটা ঠিক করতেই বেলা পড়ে যায়। তার ওপর অনেক অব্যঞ্জিত সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে। যা পাশ কাটালে স্ত্রীর মুখ ভার হয়। বিয়ে, পৈতে, বাচ্চার নামকরণ। ‘আপনি কিভাবে লেখেন দেখতে এলাম’। ‘মাত্র দু-মিনিটের একটা ইন্টারভিউ’ ‘তসলিমার বইটা সম্পর্কে আপনার মতমতটা একটু যদি’— ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় বহু আক্রমণ সর্বদা প্রতিহত করা যায় না। তাতে সময় নষ্ট নয়। নারায়ণ সান্যাল ব্যক্তিগত জীবনে পাঠকের কাছে নারায়ণ ছিলেন, নারায়ণ-শিলা নয়। পাঠকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলতেন। মফঃস্বলের ছোট কাগজগুলিকেও গুরুত্ব দিতেন কারণ নারায়ণ তো ভক্ত বাছা কল্লতরু। এই যে বহু বিচিত্র চরিত্রের মানুষকে জানার চেষ্টা, জেনারেশন এর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলার বাসনা, ইতিহাসের কাহিনী লিখতে গিয়ে পুরাতন দলিল-দস্তাবেজ নিজের হাতের ঘাঁটা— এ সবই রোমান্টিক মনের পরিচয়। সান্যাল মশাই ছিলেন এক বৃহৎ পরিবারের প্রধান কর্মকর্তা। বহু বৈষয়িক সমস্যাও তো তাঁকে সামলাতে হত। শেষ কয়েকবছর অসুস্থ স্ত্রীর পাশে বসে দাম্পত্য জীবনের গুরুভার বোঝাটি বহন করে হাসিমুখে যেভাবে লিখে যেতেন সেটা এক উদাসী বাউলের পক্ষে সম্ভব। নারায়ণ-চরিত্রের একটি মহৎ গুণের কথা প্রসঙ্গত বলে রাখি। ব্যক্তিগত জীবনে বহুবার দেখেছি, বিখ্যাত ব্যক্তির আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন, বিনি পয়সায় বই-এর মলাট বা ভিতরের ছবি আঁকিয়ে নেবার মতলবে। নারায়ণবাবু এর ব্যতিক্রম। তাঁর বইয়ের অলংকরণ করেছি। মলাটও করেছি— টাকা পেয়েছি। অনেকসময় নিজের পকেট থেকে আগাম টাকা

দিয়েছেন পরে প্রকাশকের কাছে চেয়ে নিয়েছেন। আমার আঁকা বহু ছবি নিজের বইয়ে ব্যবহার করেছেন। সর্বত্র আমার নাম উল্লেখ করেছেন যথোচিত সম্মানের সঙ্গে। যদি আমার নাম উল্লেখ না করতেন আমার কিছুই করার ছিল না। কিন্তু করেছেন। মনে মনে বলেছি রামতনু লাহিড়ীর বংশধারা তাঁর রক্তে এখনো উৎসারিত বলেই সততার এই নিদর্শন। নদীয়ার রসিক নাগরিক মনের সঙ্গে আমার আবাল্য পরিচয়। একদিকে শ্রীচৈতন্যের ত্যাগ, বিনয়, উদারচিন্তে প্রেম বিতরণ, পাশাপাশি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পণ্ডিত-পালন, ব্রাহ্মণ্য আচারবিচারকে যুক্তিসিদ্ধ করার চেষ্টা এবং অবশ্যই রাজধর্মের নিয়ম মেনে দুষ্টির দমন— এই দুই ধারার মধ্যে বিচিত্র এক সমন্বয় নদীয়ার নাগরিক মন। কলকাতার উনিশ-শতকী বাবুবিলাসের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। পূজা প্রাপ্তনে বাড়ীনাচের আসর বসানোর মত দুঃসাহস রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যের মধ্যে কেউ দেখাতে সাহস করেনি। শাস্ত্রীয় আচারকে নদীয়ার ভদ্র-নাগরিক শ্রদ্ধার সাথে মান্য করতেন। বিদ্যাচর্চা অবাধে যাতে হয় সেজন্য টোলের পণ্ডিত জমি পাননি এমনটি ঘটেনি। কলকাতার দেব-লাহা-মল্লিক-সিংহ ইত্যাদি বাবু কালচারের ধারক বাহকের দল কোনো টোলের জন্য জমি দান করেছেন বলে আমার জানা নেই। কেবল নগরবাসী নয়, প্রাকৃতজনদের মধ্যেও যে সৌজন্যবোধ প্রবহমান, সেটাও অন্য জেলায় দুর্লভ।

নারায়ণ-মানস কোনো ভাবধারায় পুষ্ট সেটা বোঝার জন্য উপরোক্ত বিষয়টি উল্লেখ করলাম।

একালের সব সাহিত্যই পদ্মপত্রের টলোমলো বৃষ্টি বিন্দুর মত, বড়ই অস্থায়ী। লেখকদের জীবদ্দশায় হয়তো একাধিক সংস্করণের শিরোপা জুটে যায়। কিন্তু স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা! নারায়ণবাবুর স্মরণসভায় অনেকেই হয়তো যথোচিত অশ্রু-বরণ করে তাঁর সাহিত্যের চিরস্থায়ী মূল্যের কথা বলে যাবেন। এ ব্যাপারে বড় কোন আশা রাখি না। কিন্তু ব্যক্তি নারায়ণ সান্যালের উষ্মতা— সেটা যারা কাছে এসেছেন, সংসারে পা দিয়েছেন, তাঁদের পক্ষে সেই উষ্মতা সামনের বহু বছর শীত ঠেকাবে। এই উষ্মতা অনুভবের তাক বিছিয়ে বা কালি খরচ করে লিখে বোঝানো যাবে না। নিজে বোধহয় খেতে ভালবাসতেন। যখনই কোনো আলোচনার জন্য ডাকতেন দুপুরে বা সন্ধ্যায় ভুরিভোজনের আনন্দ ও আশংকা অপরিহার্য ছিল। ভাল বই হাতে পেলে নিজে পড়তেন, এবং ব্যাগের মধ্যে গছিয়ে দিতেন। কলেজ স্ট্রিটে দেজ পাবলিশিং-এ গিয়েছেন, আমার সঙ্গে দেখা। নিকটতম রেস্তুরেন্টে টেনে নিয়ে গিয়ে বসালেন। অর্ডার দিলেন। না কোন স্বার্থ নেই। একটু সঙ্গ চান বা কোন বিশেষ ব্যাপারে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিতে চান। তাঁর মতো লম্বা মাপের মানুষ অনেক হয়ত পাবো, কিন্তু উষ্মতা পাবো না। কারণ— সখা, সে যে বহু সাধনার ধন।

‘সত্য-নারায়ণ’

প্রদীপ দত্ত

খুব বকুনি খেতে পারি জেনেও নিজেকে কিরকম গিরীশ-গিরীশ মনে হয়। মানে ঐ গিরীশ ঘোষ আর কি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের আগে ‘কোলকাতার’ আশেপাশে শিক্ষিত চরিত্রবাহু ‘ভদ্রলোকের’ সংখ্যা কি কম ছিল? তারা পারলেন না, আর ঐ মাতাল দুশ্চরিত্রি গিরীশ কিনা দক্ষিণেশ্বরের পাগলা ঠাকুরের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে তার চেলা বনে গেল।

ঠাকুমা-জেঠিমা-মাসিমা-কাকিমারা কালো নুড়ি পাথর নিয়ে আজীবন ধরে সত্যনারায়ণের কাছে সিমি দিয়ে দিয়ে এক সময় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে এ জীবনের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। আর ঐ পাথরের নারায়ণ টন টন সিমি উদরস্থ করেও ওঁদের একমুহুর্তের জন্যেও দেখা দিলেন না। অথচ আমি নামক আজীব জীবটাকে দেখুন, শ্লেচ্ছ-অপদার্থ-অপগণ্ড-অশিক্ষিত আমিটা কোনোকালে না ডেকেও জীবনের শেষ কটাবছর ধবধবে সাদা টুকটুকে সুন্দর যে নারায়ণের মতো নারায়ণ পেলাম তা নিয়ে আরো দশটা জন্মো কাটিয়ে দিতে পারবো। ঠান্মা একবার এসে দেখে যাও, তোমাদের সিমি দেওয়ার পুণ্যিটা যোলো আনা কেন আঠার’ আনা ভোগ করছি আমি।

তোমাদের ঐ নুড়ি নারায়ণ-এর কতটুকু দেবার ক্ষ্যামতা ছিলো গো? দ্যাখোতো আমার এই নর-নারায়ণকে। তোমার এই রং-তুলি-কাগজ-মোম নিয়ে খেলা করা অপদার্থ নাতিটিকে উনি যাবার কালে শিল্পীর স্বীকৃতিটা দিয়ে গেলেন (ওঁর জীবনকালে প্রকাশিত শেষ পুস্তক ‘আর্টিমিসিয়া’র উৎসর্গ পত্রটা দেখে নিও)। গত সাতই ফেব্রুয়ারী উনি চলে যাবার পর ওঁকে নিয়েই আমার কলম ধরার বহর দেখে মনে হচ্ছে লেখক না বনে যাই আবার। খেলারছলে ক্যামেরা বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো তো সেই কবেকার নেশা। কিন্তু আলোকচিত্রী হিসাবে তো কোনোদিন স্বীকৃতি পেতে পারি ভাবিনি। কিন্তু আজ ‘নারায়ণ সান্যাল’ কে নিয়ে ক্রোড়পত্র প্রকাশকালে পরিধি সম্পাদকের অনুরোধে আমাকে নারায়ণ সান্যাল ও তাঁর আলোকচিত্র প্রসঙ্গে কিছু কথা লেখার তোড়জোড় করতে হচ্ছে।—কিন্তু কি লিখব? কিছু ভেবে তো কখনো ভিউ ফাইণ্ডারে চোখ রাখিনি। কখনো কল্পনাও করিনি ওঁর শ্রাদ্ধ বাসরে কিংবা নানান স্মরণ সভায় আমার তোলা ছবির মধ্যে থেকেই উনি নজর রাখবেন, যে কিভাবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমরা। জ্বল জ্বল করা প্রাণবন্ত চোখ দুটো এখনও প্রশ্নই দেয়, শাসন করে, বলে, ‘প্রদীপ, কলম যেন সত্যি কথা বলে’। সত্যের পূজারী নারায়ণ সান্যাল মিথ্যাকে ঘৃণা করতেন।

মাত্র চার বছর চার মাস পাওয়া ওঁকে। সেটা ২০০০ সালের অক্টোবর, সপ্তমী পূজো। ফোনে প্রথম আলাপ। একটা ডাক দিলেন—সারাটা রাত ছটফটানি-ঘুম নেই। বিশ্বাসঘাতক-হংসেশ্বরীর স্রষ্টা ডেকেছেন আমায়। ঘুম আসে কখনো? অরিগামি, হ্যাঁ ঐ কাগজ ভাঁজের খেলাটার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ঐ শিল্পটাইতো ওঁর কাছে পৌঁছে দিয়েছে আমার ঠিকানা, ফোন নম্বর। রাত তখন আটটা থেকে কাঁটা-টা সামান্য নটার দিকে, ফোনটা বেজে উঠেছিল। আমার স্ত্রী রিসিভারটা তুলে নিল। ওপারের কণ্ঠস্বর তো শুনিনি, এপারেরটুকু... ‘হ্যালো ... হ্যাঁ আছেন ... আপনি কে বলছেন?

... ধরুন দিচ্ছি।' ব্যাস্ রিসিভারটা এগিয়ে এলো 'ধরো, কে নারায়ণ সান্যাল ফোন করেছেন'। তখনো বুঝিনি কি হতে চলেছে। কি যেন একটা লিখছিলাম ... না তাকিয়ে বাঁ হাতে রিসিভারটা ধরে লেখার দিকে চোখ রেখে কানে ধরলাম ... তারপর? সে অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে লেখা যাবে। উনি ফোনে কাজের কথা ছাড়া বেশী কথাই বলতেন না, পরবর্তীকালে দেখেছি সেটা। ওপারে যে নর-নারায়ণ, কি করে বুঝবো তখন?

'আপনি কে বলছেন?'— আমার প্রশ্নের উত্তরে বয়স্ক গভীর কণ্ঠস্বর যা বললেন তাতে আমি একেবারে ...। 'আমি নারায়ণ সান্যাল, একটু-আধটু লিখিটিখি, তা যে ব্যাপারে আপনার সঙ্গে ... সেটা হল ঐ অরিগামি' ...। ছিলো ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা উঠে বসলাম। পরের দিন সকালে মহাষ্টমীর ভোরে ১৩/১ চক্রেবেড়িয়া রোড (নর্থ) ছুটু লাগলাম। সেদিন এতটাই ঘোরে ছিলাম যে ক্যামেরা নেবার কথা মাথায় ছিল না। তারপর থেকে নারায়ণ সান্যালের কাছে গেছি অথচ ক্যামেরা ছিল না এমন দিন কম হয়েছে। প্রথম আর শেষ সাক্ষাৎকার ছিল ব্যতিক্রম। আটাই ফেব্রুয়ারী কেওড়াতলা মহাশ্মশানের পথে ওঁর শেষযাত্রার সময় সৌমিত্র অর্থাৎ ওঁর ছোট জামাই-এর অনুরোধ সত্ত্বেও ক্যামেরাটা সঙ্গে নিতে পারিনি। আসলে বক্বকে, বক্বকে যে মানুষটা বন্দী আছেন আমার ক্যামেরায় নানা মুহুর্তে, নানা ভঙ্গিতে-সেগুলো দেখলে মনে হয়, এতো উনি লিখছেন; কথা বলছেন; চা করছেন-যোগব্যায়াম করছেন, আবার কখনও বা ছোট্ট পুচকে নাতনির সঙ্গে ছেলে মানুষী করছেন— ঐ নারায়ণ নিয়েই কাটুক না আমাদের বাদবাকি জীবনটুকু। প্রাণবন্ত অমন মানুষের প্রাণহীন দেহটার ছবি তোলার ইচ্ছে একটুও করেনি।

কত সময়ের কত মুহুর্তের কথা মনে পড়ছে। উনি নিজেও ছবি তুলতে ভালোবাসতেন। অরণ্যদগু-দগু-শবরীর স্রষ্টা কর্মজীবনের প্রথম দিকে দগুকারণে ছিলেন বেশ কিছুদিন। ঐ সময় ওখানকার আদিবাসিদের অনেক ছবি তুলেছিলেন। কিছুকাল আগে সেই অ্যালবামটা তুলে দিয়েছিলেন আমার হাতে। সেই আমি, যখন যেভাবে চেয়েছি ক্যামেরার সামনে সেভাবেই পেয়েছি তাঁকে। আবার মাঝে মাঝে বকুনিও লাগাতেন ছবির পেছনে অতো খরচ করার জন্য। মৃত্যুর ঠিক একমাস আগে সাতই জানুয়ারী ২০০৫ কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গ-সংস্কৃতি উৎসবে উনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ওঁনার ছোট মেয়ে মৌ-এর অনুরোধে আমি ওঁর সঙ্গী হয়েছিলাম। ঐ ধরণের অনুরোধগুলো যে আমাকে কি আনন্দ দিতো তা, পাঠক নিশ্চই আন্দাজ করতে পারছেন। গাড়িতে যেতে যেতে ওঁর ছবি তুলছিলাম। মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে পথের ধারের চা-দোকানে, কাঠের বেঞ্চিতে বসে চা খেতে খেতে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার মুহুর্তগুলো ক্যামেরা বন্দি করা ছিল বলেই তো ওঁকে চিনতে পারা যায় যে, অসাধারণ হয়েও কী সাধারণ। ক্যালকাটা ক্লাবে যাঁরা ওঁর সঙ্গে ডিনার করেছেন, তাঁদের অনেকেই কল্পনা করতে পারবেন না, পথের ধারে কাঠের বেঞ্চিতে অমন একটা দৃশ্য। কিংবা গত বছর সতেরোই এপ্রিল ২০০৪ (যার আগের দিনটা ছিল চার্লি চ্যাপলিনের জন্মদিন) দুর্গাপুর স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় একটা মাল বওয়া ট্রলি ভ্যানে বসে আছেন, এ যুগের সব্যসাচী কথা সাহিত্যিক! না, চমকাবার কিছু নেই, যারাই ওঁর সঙ্গ করেছেন তারা সবাই জানেন ওঁকে, এমন ভাবেই।

ঠাকুমা-দিদিমার নারায়ণ পারবেন না কোনদিনই, আমার এই প্রজ্ঞাবান-সৃজনশীল-স্থিতিধী-বীতরাগ

নারায়ণের মতো একচোঙ্গা ঝালমুড়ি কিনে বলতে, ‘এসো প্রদীপ, এটাই দুজনে ভাগ করে খাই’ কিংবা ‘দাঁড়াও, দু-কাপ চা করে নিই’— এই দুর্লভ মুহূর্তকে ক্যামেরা বন্দি করার সৌভাগ্য হওয়ার জন্য আমি ভীষণ অহংকারী।

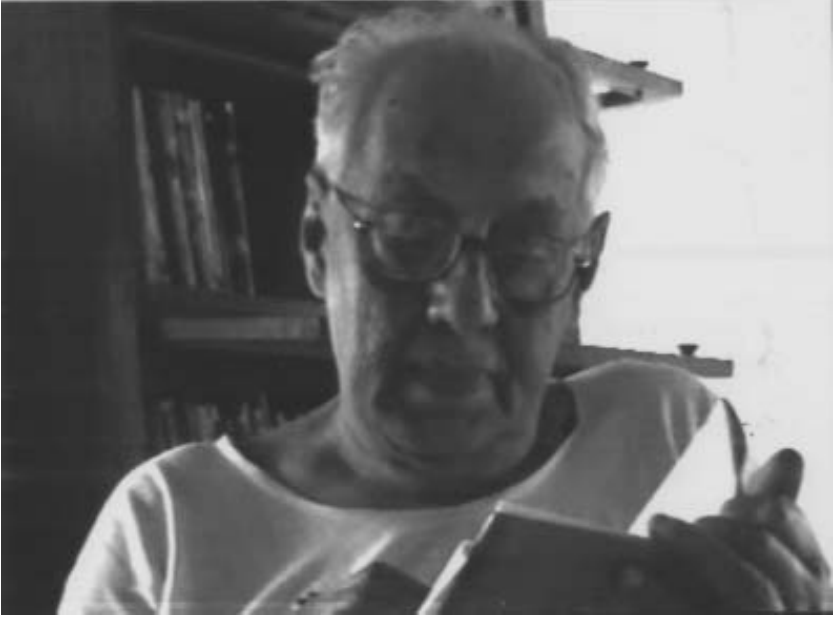
কবিশুঙ্ককে কেউ যদি আদুর গায়ে যোগ ব্যায়ামরত অবস্থায় দেখে থাকেন আর তা সেলুলয়েডের ফিতেয় বন্দি করতে সক্ষম হতেন তাহলে তার কি অবস্থা হত? রবিবাবুর ভাবশিষ্য নারায়ণবাবু কিন্তু ঠিক ঐ অবস্থায় রয়ে গেছেন আমার ভিডিও ক্যামেরায়। রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে মৃণালিনী দেবীকে দুহাত দিয়ে গালে, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছেন এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করা যায়? নারায়ণ সান্যাল তাঁর চুয়ান বছরের সঙ্গিনী সবিতা দেবীকে ঠিক ঐ ভাবেই মাথায় হাত বোলাচ্ছেন। কিংবা কাঁটা সিরিজের গল্পে পড়া সত্যসন্ধানী পি. কে বাসু ছুইলচেয়ারে বসা রাণী দেবীকে যেভাবে সযত্নে ঠেলে নিয়ে চলেছেন লাইব্রেরী থেকে চেম্বারের দিকে (‘যমদুয়ারে পড়ল কাঁটা’ পৃ: ১১), ঠিক সেভাবেই মাসিমাকে ছুইল চেয়ারে বসিয়ে মেসোমশাই নিয়ে আসছেন আমার ক্যামেরার দিকে— আছে ভাই, এমন অনেক কিছু আছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে পাওয়া ঐ ক্যামেরা আমার স্মৃতিকে আজ উস্কে দিচ্ছে।

কারুর কখনও যদি ইচ্ছা হয়, আমার কাছে এসো, আমার প্রাণের ঠাকুর, মনের ঠাকুর প্রেমে পরিপূর্ণ অমন একটা জালা থেকে কয়েক গণ্ডুস ঠান্ডা মিষ্টি জল পান করে তেপ্টা মেটারো তোমাদের সকলের সঙ্গে বসে। ভালো জিনিস একা ভোগ করায় কোনো আনন্দ নেই। তাইতো সকলকে ডেকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে করে। এগুলোই তো আমার সতনারায়ণের সিন্ধি, বাতাসায় ছুঁইয়ে, একটুখানি মুখে দিলেই পুণ্য।

প্রদীপ দত্ত : শিল্পী ও লেখক। অন্তত কুড়িটি মিডিয়ায় কাজ করেছেন ও করেন। অত্যন্ত বর্ণময় চরিত্র।



লেখক
নারায়ণ
সান্যালের
ছবি
তুলছেন



পাঠমগ্ন নারায়ণ সান্যাল

আলোকচিত্র : প্রবীর দত্ত





যোগব্যায়ামরত নারায়ণ সান্যাল

আলোকচিত্র : প্রবীর দত্ত





চা করছেন নিজের হাতে।

আলোকচিত্র : প্রবীর দত্ত







স্ত্রীর সঙ্গে নারায়ণ সান্যাল

আলোকচিত্র : প্রবীর দত্ত





বইমেলাতে স্বাক্ষর দিচ্ছেন

কল্যাণীতে রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে





দুর্গাপুর স্টেশনে

আলোকচিত্র : প্রবীর দত্ত





টেলিফোনে কথা বলছেন

আলোকচিত্র : প্রবীর দত্ত

আমার সাথে আড্ডায় মশগুল



নারায়ণ সান্যাল রচিত গ্রন্থ

[প্রকাশের ক্রম অনুসারে সাজানো। A-R গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সূচক নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমে : A শিশু ও কিশোর সাহিত্য; B সদ্যসাক্ষর সাহিত্য; C না মানুষ সংক্রান্ত, D বিজ্ঞান আশ্রয়ী; E চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য; F ভ্রমণ-সাহিত্য; G স্মৃতিচারণধর্মী; H মনোবিজ্ঞানী আশ্রয়ী; I প্রয়োগবিজ্ঞান; J গোয়েন্দা গল্প; K গবেষণাধর্মী; L উদ্বাস্ত সমস্যা-আশ্রয়ী; M ইতিহাস-আশ্রয়ী; N জীবন-আশ্রয়ী; O দেবদাসী-সম্পৃক্ত; P নাটক; Q সামাজিক উপন্যাস; R সংকলন গ্রন্থ]

* চিহ্নিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না, লেখকের ইচ্ছায় পুনর্মুদ্রণ হবে না।

চিহ্নিত বই যুক্তাক্ষর- বর্জিত-নিতান্ত শিশুদের জন্য।

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. মুশকিল আসান P | 24. পাষণ্ড পণ্ডিত Q |
| 2. বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প L | 25. কালোকালো A |
| 3. বন্দীক L | 26. শার্লক হেবো A |
| 4. গ্রাম্যবাস্ত B | 27. জাপান থেকে ফিরে F/M/K |
| 5. পরিকল্পিত পরিবার B | 28. আবার যদি ইচ্ছা কর Q/N |
| 6. বাস্তববিজ্ঞান I | 29. কারুতীর্থ কলিঙ্গ E |
| 7. ব্রাত্য Q | 30. গজমুক্তা C/Q/K |
| 8. দশে মিলি B | 31. 'আমি রাসবিহারীকে দেখেছি' N/Q |
| 9. মনামী H/Q | 32. বিশ্বাসঘাতক D/Q/K |
| 10. অরণ্যদণ্ডক L/Q | 33. হে হংসবলাকা D/K |
| 11. দণ্ডকশবরী F/Q | 34. সোনার কাঁটা J |
| 12. Handbook of Estimating I | 35. মাছের কাঁটা J |
| 13. অলকন্দা Q | 36. অঙ্গীলতার দায়ে Q/K |
| 14. মহাকালের মন্দির M/Q | 37. লালত্রিকোণ K/Q |
| 15. নীলিমায় নীল Q | 38. আজি হতে শতবর্ষ পরে D |
| 16. পথের মহাপ্রস্থান F/K | 39. অবাক পৃথিবী D/Q |
| 17. সত্যকাম Q | 40. নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা D/Q |
| 18. অন্তর্লীনা H/Q | 41. পঞ্চশোখের্ণ G/R/N |
| 19. অজস্তা অপরূপা E/F/K | 42. পথের কাঁটা J |
| 20. তাজের স্বপ্ন Q/H | 43. চীন-ভারত লঙ মার্চ D/Q |
| 21. নাগচম্পা J/Q | 44. হংসেশ্বরী M/N/Q |
| 22. নেতাজী রহস্য সন্ধান K/F | 45. প্যারাবোলা স্যার Q |
| 23. 'আমি নেতাজীকে দেখেছি' N | |

46. ঘড়ির কাঁটা J
47. কুলের কাঁটা J
48. আনন্দ-স্বরূপিণী M/N/Q
49. লিভবার্গ N/M/Q
50. তিমি-তিমিঙ্গিল C/K/Q
51. কিশোর অমনিবাস A
52. ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন E/K
53. গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা I
54. গ্রামের বাড়ি I
55. অরিগামি A/K
56. লা-জবাব দেহলী অপরূপা আগ্রা E/K
57. না-মানুষের পাঁচালী C
58. সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম Q
59. সুতনুকা কোন দেবদাসীর নাম নয় O/Q
60. রাস্কেল A/C
61. Immortal Ajanta E/F/K
62. Erotica in Indian Temples E/K
63. রোদাঁটা N/M/E/K
64. ষাট-একষাট G
65. মিলনাস্তক Q
66. নাক-উঁচু A/P
67. ডিজনে ওয়ার্ল্ড A/F
68. উলের কাঁটা J
69. লাডলিবেগম M/N/O
70. পুরবৈয়াঁ Q
71. প্রবঞ্চক E/N/Q
72. অ-আ-ক-খুনের কাঁটা J
73. পয়োমুখম্ K/F
74. না-মানুষী 'বিশ্বকোষ'— এক C/K/D/A
75. অচ্ছেদ্যবন্ধন Q
76. না মানুষের কাহিনী A/C
77. সারমেয় গেণ্ডকের কাঁটা J
78. ছয়তানের ছাওয়াল Q
79. হাতি আর হাতি A
80. আবার সে এসেছে ফিরিয়া G
81. ছোঁবল Q/K
82. রূপমঞ্জরী—এক K/N/Q
83. না-মানুষী 'বিশ্বকোষ'— দুই C/K/D/A
84. কাঁটায় কাঁটায়—এক J
85. কাঁটায় কাঁটায়—দুই J
86. গাছ-মা A
87. মান মানে কচু Q
88. আশ্রপালী Q
90. স্বর্গীয় নরকের দ্বার R/K/E
91. 'এমনটা তো হয়েই থাকে' Q/M
92. রিস্তেদারের কাঁটা J
93. কৌতুহলী কনের কাঁটা J
94. 'যাদু এ তো বড় রঙ্গ'-র কাঁটা J
95. 'অভি নী-ধাতু অ'-এর কাঁটা J
96. ন্যায়নিষ্ঠ ন্যাসনাশীর কাঁটা J
97. দ্বি-বৈবাহিক কাঁটা J
98. যমদুয়ারে পড়ল কাঁটা J
99. বাস্তুশিল্প I
100. এক, দুই.. তিন... K/P
101. রানী হওয়া Q
102. হিন্দু না ওরা মুসলিম Q/K
103. কাঁটায় কাঁটায়—তিন J
104. বিশের কাঁটা J
105. সেরা বারো R
106. খোলামনে R
107. বুলডোজার লেডি K/R/N/Q
108. খাণ্ডবদাহন G/K
109. ভুতায়ন A

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 110. ড্রেস রিহাসালের কাঁটা J | 121. শহিদ তপর্ণ/প্রসঙ্গ কাশ্মীর |
| 111. রানী কাদম্বিনী এবং... N | 122. মোনালিজার কাঁটা J |
| 112. দান্তে ও বিয়াক্রিচে... N/M/E/K | 123. অবিস্মরণীয় MR |
| 113. দেবদাসী সুতনুকা O/K | 124. অনির্বচনীয় MR |
| 114. কাঁটায় কাঁটায়— চার J | 125. বাছাই গল্প R |
| 115. রূপমঞ্জরী—দুই K/N/Q | 126. কিশোরী সাহিত্য |
| 116. অগ্নিকন্যা মমতা N | 127. কিশোর সাহিত্য |
| 117. কড়ুরয় ও খুকু-মা A | 128. কাঁটায় কাঁটায়— পাঁচ |
| 118. দর্পণে প্রতিবিম্বিত কাঁটা J | 129. কাঁটায় কাঁটায়— ছয় |
| 119. সকল কাঁটা ধন্য করে J | 130. শের-ই-শহিদ দ্বীপ |
| 120. এক বৃন্তে দুটি কাঁটা J | 131. কলকলতার সন্ধানে |
| | 132. ফিরে দেখা: গান্ধীজি/নেতাজি |

বিন্দু

এই সংখ্যার পুনর্মুদ্রণ কিছু ভিন্ন প্রকৃতির।

নারায়ণ সান্যাল স্মরণিকার অংশ হিসাবে তাঁর লিখিত ‘বাসাবদল’ গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হল। গল্পটি কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত ‘হোমশিখা’ পত্রিকায় ১৩৬২ সালে আশ্বিন, তৃতীয় বর্ষ একাদশ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

সম্পাদক ছিলেন শ্রী ননীগোপাল চক্রবর্তী ও শ্রী কালীপ্রসাদ বসু। প্রকাশক নৃসিংহ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

— সম্পাদক, পরিধি

নারায়ণ সান্যাল-এর গল্প

বাসাবদল

গৃহিণীর পীড়পীড়িতে আবার বাসাবদল করিতে হল। কলিকাতা শহরে সস্তায় মনোমত বাসা পাওয়া যে কতদূর বিড়ম্বনা তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন বুঝিবে না। এবার আসিয়াছি বেহানা অঞ্চলে। ট্রাপডিপোর শেষ প্রান্তেরও পরে একটি গলির ভিতর নোতুন কলোনী। ফ্ল্যাট সিস্টেম বাড়ী। দেড়খানি ঘর, ভাড়া চল্লিশ। গৃহিণীর কিন্তু পছন্দ হইয়াছে; कहিলেন— “এই ভালো, বেশ ফাঁক ফাঁক। আগের বাসাটা ছিল কলকাতার বুকের ওপর, আলোয় চোখ

ধাঁধিয়ে যায় আবার ধোঁয়ায় চোখে জল আসে।”

আমি নিরীহের মতো কহিলাম— “আলো ধোঁয়া ছাড়াও কতরকম জিনিসই না আছে মধ্য কলকাতায়। চোখে ধাঁধা লাগা অথবা চোখে জল আসাটা আর বিচিত্র কি?”

গৃহিণী বিষদৃষ্টি হানিয়া নীরব হইলেন। বাসা বদলের পূর্বেকার বিশ্রান্তলাপ স্মরণ হইল বোধহয়!

আমাদের আগের বাসাটির অপর দিকে ছিল মেয়েস্কুলের হস্টেল!

ফ্লাট সিস্টেম বাড়ী। প্রতিবেশীদের সহিত আলাপ হয় নাই। সময় কোথা? নারী মাত্রই অনুসন্ধিসু। দুদিন যাইতেই গৃহিণী কহিলেন,

—“আমাদের ওপাশটায় কে থাকে দেখেছো?”
দেখিয়াছিলাম; কিন্তু মুখে বলিলাম— “কই নাতো?”

—“একটি বিধবা মেয়ে থাকে—একেবারে একা। আর একটা বুড়ি ঝি।”

কহিলাম— “তা হ’বে।”

গৃহিণী বলিলেন,— “আমার কিন্তু মনে হয় বুড়িটা ওর ঝি নয়— শ্বশুড়ী। ঐ বিধবা মেয়েটির রোজগারেই আছে। মেয়েটি রোজ দশটা পাঁচটা অফিস করে, দেখনি?”

অধিকাংশ দিনই একই ট্রামে যাতায়াত করি। না দেখিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই, তবু কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলাম না। মানে স্বীকার করিতে পারিলাম না।

আশ্চর্য মেয়েটি! সপ্তাহে অন্তত পাঁচদিন এক ট্রামে যাই— তিনদিন এক ট্রামে ফিরি; কিন্তু কোনও দিন কথাবার্তা হয় নাই। বয়স আমারই সমান হইবে অর্থাৎ সাতাশ-আটাশ। একহারা ফর্সা চেহারা। বেশ সপ্রতিভ; অথচ একটি মার্জিত শালীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে। যাতায়াতের পথে লক্ষ্য করি; জানি না অপরপক্ষও আমাকে লক্ষ্য করে কিনা। ক্যামেলিয়ার ভাষায় বলা চলে ‘আর কিছু না হ’ক ওতো আমার সহযাত্রিনী।’ কথাটা মনে হইতেই নিজেকে শাসন করি। কী উৎসুটে চিন্তা সব! নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হই।

অফিস ফেরৎ আমি ট্রামে উঠি এসপ্লানেডে; মেয়েটি ওঠে ফার্পোর স্টপেজ। দু’একদিন ভীড়ে উঠিতে সাহায্য করিলাম। সে ফিরিয়াও চাহিল না। মনে মনে বলিলাম— মেয়েটি কি ভাবে তাহার ধন্যবাদের প্রত্যাশায় এটুকু করিতেছি? মহিলার প্রতি এটুকু সম্মান দেখানো উচিত বলিয়াই করি। মন ফিৎ করিয়া হাসে। আমি অন্য দিকে চাহিয়া রাগ করিয়া বসিয়া থাকি।

একদিন লেডিস সীটে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ফিরিতেছি! ফার্পোর মোড়ে যথারীতি প্রতিবেশিনী উঠিলেন। কণ্ঠকটর হাঁকিল ‘লেডিস সীট!’ শুনিয়াও শুনিলাম না। কণ্ঠকটরের ধ্বনি যাত্রীদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইল। চমকিয়া ঘাড় ঘুরাইলাম। অন্যদিকে চাহিয়া মেয়েটি পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। উঠিলাম। ভরী রাগ হইল। মেয়েটা ভাবে কি? ঐ তো প্যাকাটির মতো চেহারা। আমাকে পাশে বসিতে বলিলে কি আমি তাহাকে জ্যান্ত খাইয়া ফেলিতাম? সাধারণ ভদ্রতটুকুও নাই। স্থির করিলাম তাহার সহিত কোনও ভদ্রতা করিব না। তাহার যোগ্য নয় সে। রাগে গৃহিণী বলিলেন, “জানো নমিতাদি এম. এ পাশ!”

কহিলাম— “নমিতাদিটা আবার কে?”

—“ঐ যে ওপাশের ফ্ল্যাটের বিধবা মহিলাটি তুমি দেখনি?”

রুথিয়া উঠিলাম— “দশটা পাঁচটা কলম লিখতেই প্রাণান্ত, তার উপর খবর রাখো কে এম. এ পাশ বি এ ফেল!”

—“ভারি ভালো মেয়েটি; কথা বলে কম। কথা বলবেই বা কার সঙ্গে? ওর সমান লেখাপড়া জানা মেয়েই কি আছে নাকি পাড়ায়।”

বলিলাম “তোমাদের সঙ্গে কথা বলবে কেন? সে সহকর্মী আছে, বড়বাবু আছেন, সাহেবরা আছেন কথা বলার আশ অফিসেই মিটিয়ে আসেন বোধহয়”

“মনেও ভেবনা তা। গায়ত্রীদি বলেন পুরুষ মানুষের দিকে চোখ তুলে তাকাতোও জানেন না নমিতাদি!”

—“আচ্ছা বাপু আচ্ছা; এখন ঘুমাও তো! সারা দিন খালি নমিতাদি আর গায়ত্রীদি!”

ও পক্ষ চূপ করে। এ পক্ষের কিন্তু নিদ্রা আসে না। আবার মনে পড়ে ক্যামেলিয়ার কথা। ভদ্রগোছের ভালুকও একটা দেখা দেয় না? উদ্ধার করিয়া জীবন সার্থক করার প্রশ্ন ওঠে না। আমি লেডিস্ সীট ছাড়ার সময় যেমন অন্যদিকে চাহিয়া না দেখার ভান করিয়াছিল তেমনি অন্যদিকে চাহিয়া উপভোগ করিতাম গর্বিতা নারীর উপর ভদ্রগোছের ভল্লুকের আক্রমণ!

সেদিন সন্ধ্যায় কি একটা কারণে ট্রাম বাসের স্ট্রাইক হইল। অফিস হইতে বাহির হইলাম আলিপুর ও বেহালা অঞ্চলবাসী অফিসের পাঁচ ছয় জনে শেয়ারে একটি ট্যাক্সি করিলেন। আমাকেও দলে টানিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইল— কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি হইলাম না। ধীরে ধীরে পদব্রজে রওনা হইলাম। দেখি কতদূর হাঁটা যায়। ফার্পো স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত আসিয়া মনে হইল একটু বিশ্রাম করা দরকার। প্রায় আধ ঘণ্টা, দাঁড়াইয়া আছি। হঠাৎ মনে হইল এ কি পাগলামি? অবচেতন মনটা চেতনমনের কাছে ধরা পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাঁটিতে সুরু করিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে। রাস্তায় আলো জ্বলিয়াছে। রাস্তা পার হইয়া একটা ট্যাক্সি ডাকিতে যাইব হঠাৎ দেখিলাম হ্যাঁ আমার প্রতিবেশিনীই! সুউচ্চাঙ্গী একটি সুশ্রী যুবক একখানা সিডানবডি প্রাইভেট কারের দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে— অনতিদূরেই দাঁড়াইয়া তিনি। সেই ‘ভারী ভালো মেয়েটি— কথা বলে কম’। দুজনে অনর্গল কত কথাই না বলিয়া চলিয়াছে। আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। মনে পড়িল গৃহিণীর ন্যাকা কণ্ঠস্বর ‘গায়ত্রীদি বলেন পুরুষ মানুষের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও জানেন না নমিতাদি’ যাক্ এতদিনে প্রত্যাশিত দৃশ্যটি চোখে পড়িল। একটা দুর্ভাবনা যেন নামিয়া গেল। কিন্তু চলিয়া যাইতে পারিলাম না। গাড়ীখানির অপর দিকে ধীরে ধীরে সরিয়া গেলাম। এবার কথোপকথন স্পষ্ট শোনা যাইতেছে। একবার মনে হইল ছি ছি আমি কী করিতেছি কিন্তু দুর্নিবার কৌতুহলের প্লাবনে সে ছি-ছি মুহূর্তেই ভাসিয়া গেল। যুবকটি মনে হয় নমিতাকে গাড়ীতে উঠিতে বলিতেছে সে রাজি হইতেছে না। আরও সরিয়া

আসিলাম।

“— না না, আপনি থাকেন শ্যামবাজার আমি যাবো বেহালা আপনি এতটা ঘুরবেন কেন? আমি ট্যাক্সি করে নিচ্ছি বরং”

“—বিলিভ মি নমিতা দেবী বেহালায় আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় একটা এ্যাপন্টমেন্ট আছে— তাইতেই আপনাকে লিফট দিতে চাইছি!”

“—না না থাক্ বরং। আপনার ড্রাইভারও আজ আসেনি দেখেছি। আপনাকেই উণ্টো মুখে এতটা ড্রাইভ করে”

“উণ্টোমুখ নয় নমিতাদেবী— লস্কের বিপরীত দিকে চলা আমার স্বভাব নয়। আর ড্রাইভার নেই তাতে কি হয়েছে। একলা আমার পাশে বসলে নিশ্চয়ই আমি আর আপনাকে টপ্ করে গিলে ফেলব না!”

“— কী যে বলেন!” মেয়েটি সহাস্যে বলে! ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া বলি “ওগো মহাশয়া সেদিন কিন্তু এক ট্রাম লোকের উপস্থিতিতেও আপনি একটি ভদ্রসন্তানের পাশে বসে যেতে রাজি হননি!”

আর দাঁড়াইবার প্রয়োজন ছিল না। মেয়েটির স্বরূপ বুঝিয়াছি। এ জাতের মেয়েরা সাধারণত যা হয়। উত্তেজিত না হইলে ক্যামেলিয়া কবিতার সেই শাঁওতাল পরগণার দৃশ্যটা মনে পড়িত। আমি এখানে বাহুল্য! একটু স্থান নেই আমার! আগাইয়া গিয়া ডাকিলাম “এই ট্যাক্সি!” দেখিলাম দুজনেই আমার দিকে ঘুরিল। আমি আর পিছন ফিরিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

“— আরে মেজদা যে!”

অসতর্ক আক্রমণে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গিলাম। ট্যাক্সির উন্মুক্ত দ্বারের সম্মুখে ঘুরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল কাহাকে সম্বোধন করিল মেয়েটি। ঘুরিলাম। নমিতা আমাকেই সম্বোধন করিয়াছে। আচমকা আসিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিল! এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পাই নাই! দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। সমস্ত মুখে রক্ত নাই। কোন রকমে বলিল—

“— তুমি বাসায় যাচ্ছে তো? চল আমিও যাবো।” যুবকটির দিকে ফিরিয়া আবার বলিল “আর লিফটের প্রয়োজন হবে না— মেজদার দেখা

পেয়ে গেছি। থ্যাঙ্ক য়ু অল দি সেম মিঃ বাসু।”
করায়ত্ত শিকার হাতছাড়া হইলে হিংস্র ব্যাঘ্রের
যেরূপ মুখভঙ্গি হয় সেইভাবে চাহিয়া রইলেন
মিষ্টার বাসু। তাঁহার মুখের উপর একরাশ ধোঁয়া
ছাড়িয়া আমাদের ট্যাকসি চলিল। নমিতার মুঠাটি
তখনও আমার হাতের মধ্যে থর থর করিয়া
কাঁপিতেছে। হঠাৎ সম্মিত পাইয়া সে ওপাশে সরিয়া
বসিল। দুর্নিবার বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াই
বোধহয় ওর সমস্ত সংযম ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।
জানালার বাহিরে মাথা রাখিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া
কাঁদিতে লাগিল। আমি কাঠের পুতুলের মত বসিয়া
আছি। নীরব দর্শক! মমিনপুর, বেহালা ব্রীজ, ট্রাম
ডিপো। আমি ট্যাকসি থামাইয়া বলিলাম “—
আসুন এখানেই নামি। এটুকু হেঁটেই যাওয়া যাক।”

এরূপ একটি রোরুদ্যমানা অপরিচিত যুবতীর
সঙ্গে এক ট্যাকসি করিয়া বাড়ীর দ্বার পর্যন্ত যাওয়ার
আমার সাহস ছিল না!

নমিতা নামিল। ততক্ষণে সামলাইয়াছে সে।
ট্যাকসির ভাড়া কিছুতেই আমাকে মিটাইতে দিল
না। পীড়াপীড়ি করায় শাস্ত কণ্ঠে কহিল “আপনি
আমায় আজ যে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন এ কটা
টাকায় তা কিনতে চাইছি না আমি!”

আগে পিছে করিয়া দুজনে একই প্রবেশ দ্বারে
মাথা গলাইলাম। ট্রাম হইতে রোজ যেমন ফিরি।

রাত্রে মনস্থির করিয়া গৃহিণীকে বলিলাম “এ
বাড়ীটায় সুবিধা হচ্ছে না। এস বাসাটা বদল করা
যাক।”

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন “কাল এ প্রস্তাব করলে
রাজি হতে এক মিনিট দেরী হতো না, কিন্তু আজ
আর তা অসম্ভব।”

অবাক হইয়া বলিলাম— “কেন?”

“আমরা বাসা ছাড়তে রাজি হলেও নমিতাদি
রাজি হবে না আমাদের ছাড়তে!”

আমি লাফাইয়া উঠি “—এ কথার মানে?”

গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। রহস্যময়ী
নারীর চিরন্তন মোনালিসা হাসি।

“আমি সব জানি! পাশের ফ্ল্যাটে থাকে এক
ট্রামে যাতায়াত ক’র অথচ ভাবখানা দেখাও যেন
চিনতেই পার না! তখনই কিছু একটা সন্দেহ
করেছিলাম। এতটা ভালো তো তুমি নও!”

সমস্ত শরীরে কালঘাম ছুটিতেছে! বুঝিলাম অমন
কপটসাধু তাই সর্বনাশের মূল। আমি যে সত্যই সাধু
এখন কেমন করিয়া প্রমাণ করিব?

“নমিতাদি আমাকে সব গল্প করেছে। কালকে
একসাথে ট্যাকসি করে আসাও!”

আমি নাই! এ সর্বনাশ কেন করিল মেয়েটি।

“বেচারির তিনকুলে কেউ নেই এক ঐ বুড়ি
শ্বশুড়ী ছাড়া! সোমন্ত বয়েস— রোজগার করে
খেতে হয় এমন কুড়িয়ে পাওয়া মেজদা-মেজ
বৌদির ভরসা সহজে ছাড়তে চাইবে কেন?”

আবার শুইয়া পড়িলাম। বুঝিলাম কাল সন্ধ্যায়
ক্ষণিক ভগিনীটি চিরন্তন ভগ্নীত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন।
আর ভয় নাই।

“ওগো, তুমি আমার ওপর রা করনি তো?”

“পাগল, তোমার উপর রাগ করতে পারি?”
গৃহিণীকে কাছে টানিতে গেলাম।

“না আমার উপর নয় নমিতাদির ওপর?”

আমি হাসিয়া বলিলাম “—ননদের উপর ভারি
টান দেখছি!”

আর বাসা বাদল করি নাই।